১৫-১৬
দুই খণ্ড একত্রে
চিত্র নায়ক
দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ষ্টুডিও থেকে ফিরতে রাত প্রায় দু'টো বেজে গেলো বনহুরের। স্বয়ং প্রযোজক তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সেদিনের সেটে ভিলেন বিশু রায়ের সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের কাজ ছিলো, কাজেই পরিচালক নাহার চৌধুরী আসতে পারলেন না। সুটিং শেষ হতে ভোর হয়ে যেতে পারে। কাজেই বনহুরের কাজ হয়ে যেতেই আর বিলম্ব না করে বাসায় ফিরে এলো সে।

পথে গাড়িতে বসে অনেক কথা হলো আরফানউল্লাহর সঙ্গে বনহুরের। আরফানউল্লাহ বললেন তার মত একজন সুদর্শন যুবককে তাঁর ছবির নায়ক হিসেবে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছেন তিনি। অনেকদিন থেকে তিনি এমনি একটা ছেলেকে খুঁজছিলেন—এ কথাটাই বারবার বললেন আরফানউল্লাহ। অদৃষ্ট প্রসন্ন—তাই পেয়েছেন নাকি তাকে। আরও বললেন, একদিন তাঁর বাড়িতে বনহুরকে নিয়ে যাবেন। আতিয়া নাকি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী।

বনহুর এ কথায় বলেছিলো, তাঁর বাড়িতেই রয়েছি, অথচ আজও তাঁর সাথে পর্যন্ত দেখা হলো না। আমারই কি কম আগ্রহ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার! নিশ্চয়ই যাবো--কথা দিয়েছে বনহুর।

বাসায় ফিরে সর্বাগ্রে নূরীর কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর।

খাটের উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে নূরী।

যে মেয়েটাকে নূরীর দেখাশোনার জন্য রেখেছে বনহুর সে তখনও জেগে ছিলো, বনহুর ফিরে আসতেই সে বললো—আমি এবার যাই হুজুর।

বনহুর বললো–তুমি ঘুমাওনি?

না হুজুর।

বেশ যাও, ঘুমাওগে।

মেয়েটা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো নিজের কক্ষের দিকে।

নিজের অজ্ঞাতে নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো আবার। কিছুক্ষণ নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুর তার মুখের দিকে।

হঠাৎ ইয়াসিনের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো বনহুরের—সাহেব, টেবিলে আপনাগো খাবার দেওয়া অইছে।

কে, ইয়াসিন?

দরজার বাইরে থেকে আবার শোনা গেলো ইয়াসিনের কণ্ঠস্বর— হ সাহেব, আমি ইয়াসিন। টেবিলে খাবার দেওয়া অইছে।

আচ্ছা আসছি। বনহুর কথাটা বলে নিজের কক্ষে ফিরে আসে।

জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে প্রবেশ করে বনহুর।

অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা পানিতে হাতমুখ ধোয়। এখন বেশ স্বস্তি বোধ করছে সে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে সে।

ইয়াসিন জড়োসড়োভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

খেতে খেতে বললো বনহুর—ইয়াসিন, তুমি ঘুমাওনি?

না সাহেব, আপনি না খাইলে আমি কি ঘুমাইতে পারি?

সত্যি, তুমি খুব ভাল।

কিন্তু বাড়ির মালিক কন, আমি নাকি একেবারে অকেজো।

না না, ঠাট্টা করে ওকথা তোমাকে বলেন তিনি। আচ্ছা, ইয়াসিন?

কন হুজুর!

তুমি কতদিন হয় আছো এখানে?

তা সায়েব বছর বিশ–একুশ অইব--

ওঃ তুমি তো তাহলে খুব পুরোনো লোক।

সাহেবের মাইয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন আমি আইছি।

এখন বুঝি সাহেবের মেয়ে খুব বড় হয়েছে?

কার কথা কইছেন, আতিয়া আপার কথা?

হ্যাঁ।

মস্ত বড়, আপনাগো দু'ইডা অইব।

তাই নাকি?

হ।

এমনি নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বনহুরের খাওয়া শেষ হলো।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কিছুতেই দু'চোখ বন্ধ করতে পারলো না সে। ঘুম না পেলে জোর করে তো ঘুমানো যায় না। বিছানায় ছটফট করলো কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বসলো—কি যেন ভাবলো, আবার বালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়লো। আজকের ঘটনাগুলো ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। সুটিংয়ের অবসরে যখন বনহুর বিশ্রামকক্ষে একটা সোফায় বসে সিগারেট পান করছিলো, তখন জ্যোছনা রায় প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

এ কক্ষটা শুধু নায়কের বিশ্রামের জন্যই নির্দিষ্ট করা।

বনহুর পদশব্দে ফিরে তাকাতেই অবাক হলো।

অসময়ে তার কক্ষে জ্যোছনা রায়কে দেখে উঠে দাঁড়ালো বনহুর। কিছু পূর্বেই জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে বাসর কক্ষের একটা দৃশ্যের সুটিং হয়েছে। এখনও জ্যোছনা রায়ের দেহে নববধূর ড্রেস শোভা পাচ্ছে। মেকআপের উপর চন্দনের ফোঁটাগুলো বড় সুন্দর লাগছিলো।

বনহুর হেসে অভ্যার্থন জানালো—আসুন মিস রায়।

আসুন নয়, এসো বলুন—যেমন একটু আগে বলেছিলেন।

তাহলে আপনি খুশি হবেন মিস রায়?

খুব খুশি হবো। জ্যোছনা রায় বসে পড়লো একটা সোফায়।

বনহুর তখনও দাঁড়িয়ে। সিগারেট থেকে একরাশ ধোঁয়া নির্গত করে বললো—এখানে আপনি?

গোটা রাত কাজ আছে, ভাল লাগছে না।

বনহুর একটু হাসলো। আজ কয়েকদিন হলো সে লক্ষ্য করেছে—জ্যোছনা রায় তার সঙ্গে যখন কাজ করে তখন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা উচ্ছ্বসিত ভাব, যা অতি চেষ্টা করেও গোপন রাখতে সক্ষম হয় না জ্যোছনা রায়। বনহুরের সঙ্গই যেন তার কামনা। তবে কি জ্যোছনা রায় তাকে ভালবেসে ফেলেছে! --বনহুরের ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

ষ্টুডিওর সবাই বনহুরকে মকছুদ চৌধুরীর পরিবর্তে শুধু মিঃ চৌধুরী বলে সম্বোধন করতো।

জ্যোছনা রায়ের কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর, বলে সে–অস্বস্তি বোধ করছেন না তো! বলুন তাহলে ডাক্তার ডাকি।

না না, অসুস্থ নয়-----কিছু বলতে গিয়ে জ্যোছনা রায় থেমে গেলো।

বনহুর বুঝতে পেরেছে, তবু না বোঝার ভান করে বললো –এ ড্রেসে বুঝি আপনার কাজ আছে আরও?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে?

বিশু রায়ের সঙ্গে। একটু থেমে বললো জ্যোছনা রায়–মিঃ চৌধুরী, আপনি কি এখনই চলে যাবেন?

আমার কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন আর রাত জেগে কি হবে বলুন?

জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠলো, উঠে দাঁড়ালো সে–চলি, গুড নাইট।

বনহুর তাকালো জ্যোছনা রায়ের দিকে –সে মুখে বনহুর দেখতে পেলো একটা ব্যথাকরুণ আভাস। কি বলতে এসেছিলো জ্যোছনা রায়, যা সে বলতে চেয়েও বললো না।

বাড়ি ফিরে আসার পর বারবার জ্যোছনা রায়ের কথাই মনে পড়ছে বনহুরের। ষ্টুডিওতে আর একটা ব্যাপার বিশেষভাবে তার দৃষ্টিতে পড়েছিলো এবং সেই কারণেই বনহুর জ্যোছনা রায়ের মনের কথা জানার বাসনা থাকলেও এড়িয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে।

বনহুর আর জ্যোছনা রায়ের যখন কথা হচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষের শার্শির ফাঁকে দুটো চোখ ভেসে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল।

বনহুর চিনতে পারেনি। তার চিনতে পারাও অসম্ভব ছিলো। কারণ শুধুমাত্র দুটো চোখই সে দেখতে পেরেছিলো।

আরও কয়েকবার বনহুর এই চোখ দু'টি দেখেছে।

যখনই জ্যোছনা তার কাছে এসেছে তখনই বনহুর লক্ষ্য করেছে কে যেন তাদেরকে দেখছে।

কিন্তু কে সে? যার দৃষ্টি জ্যোছনা রায় ও তার মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে?

এ চোখ দুটো শুধু বনহুরই লক্ষ্য করেছে, জ্যোছনা রায় বিন্দুমাত্র টের পায়নি।

বনহুর জ্যোছনা রায়কে ইচ্ছা করেই বলেনি কথাটা। কিন্তু সে নিজে সব সময় সংযত রয়েছে, জ্যোছনা রায় তার পাশে এলেই বনহুর তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে রেখেছে—কিছু বলতে গেলে কথার মোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে সাবধান হয়েছে—কিন্তু কোন্ অদৃশ্য ব্যক্তির এ চোখ দুটি!

শুনেছিলো বনহুর–চিত্রনায়ক অরুণ সেন গভীরভাবে ভালবাসতো জ্যোছনা রায়কে--তবে কি--

বনহুর চুলে আঙ্গুল চালাতে লাগলো। যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। না, আর ওসব কথা ভেবে মন চঞ্চল করবে না। চোখ বন্ধ করলো বনহুর, ঘুমাবে এবার। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ পড়ে রইলো, কিন্তু ঘুম এলো না তার চোখে। এপাশ ওপাশ করতে লাগলো বনহুর। তারপর হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, স্লিপিং গাউনটা আলনা থেকে টেনে পরে নিলো গায়ে।

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারী করলো সে। কক্ষের মাঝের দরজার দিকে তাকালো। ওপাশে নূরীর কক্ষ।

কখন যে সে নূরীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর নিজেই খেয়াল করতে পারেনি।

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছিলো, বনহুর নির্নিশেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে। তারপর সাবধানে আলগোছে হাত রাখলো নূরীর কপালে।

সঙ্গে সঙ্গে নূরীর ঘুম ছুটে গেলো, চমকে উঠে বসলো বিছানায়। সম্মুখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো সে—আপনি!

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো না।

নূরী রাগে ফোঁস করে উঠলো–শুধু আজ নয়, আরও কয়েক দিন আপনি— কথা শেষ করতে পারে না নূরী।

বনহুর নূরীর পাশে বসে পড়ে, ওর দক্ষিণ হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে অবেগভরা কণ্ঠে বলে—নূরী!

আমি বলছি—আমি নূরী নই, আপনি ভুল করছেন।

নূরী, তুমি কি হয়ে গেছো! আজও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না! নূরী তাকিয়ে দেখো, ভাল করে তাকিয়ে দেখো আমার মুখের দিকে।

না, কোনো কথাই আমার স্মরণ হচ্ছে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে রেহাই দিন--

এবার বনহুর রাগতকণ্ঠে বললো–নূরী, কি চাও তুমি?

আমাকে বিদায় দিন, যেদিকে আমার দু'চোখ যায় চলে যাবো।

গর্জে উঠলো বনহুর–নূরী!

শিউরে উঠলো নূরী। বনহুরের গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে নূরীর বুক কেঁপে উঠলো।

বনহুরের নিশ্বাস দ্রুত বইছে, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

বনহুরের এ রুদ্রমূর্তি দেখে নূরী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো, বুকটা ওর ধকধক করতে লাগলো। এতদিনের মধ্যে নূরী কোনোদিন বনহুরকে এমনভাবে রাগান্বিত হতে দেখেনি।

বনহুরের হাতের মুঠায় হাত দু'খানা যেন নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছিলো, খুব কষ্ট হচ্ছিলো নূরীর।

গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বললো বনহুর–আজ আমি নিঃসহায় সঙ্গীহীন –তুমি --- তুমি--কি হলো তোমার! বেশ, আর তোমাকে বিরক্ত করবো না–বনহুর

নূরীকে ছেড়ে দিয়ে নিজের কক্ষে ফিরে যায়। স্লিপিং গাউনটা খুলে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে মেঝেতে। তারপর ধপ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। দু'হাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগলো, একি হলো নূরীর! তার সম্বিৎ কোনোদিন কি আর ফিরে আসবে না? (নূরীকে বনহুর গভীরভাবে ভালবাসে–যেমন বাসে মনিরাকে।)

অসহ্য একটা ব্যথা গুমড়ে কেঁদে ফিরতে লাগলো বনহুরের মনে, কিন্তু কোনো উপায় নেই – নূরী আজ সম্বিৎহারা।

বনহুর চলে আসতেই নূরী সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

চমকে উঠলো বনহুর। দরজাটা যেন তার বুকের পাঁজরে ধাক্কা মারলো।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

সুন্দর দীপ্ত মুখমন্ডলে তখনও ফুটে রয়েছে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ।

ওদিকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলো নূরী। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় লাল হয়ে উঠছে ওর চোখ দু'টো। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব ওর কাছে। অনেক ভেবে আজও নূরী স্মরণ করতে পারেনি–কে এই যুবক, যে তার জন্য মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে। সত্যিই কি তার পরিচিত লোক ঐ যুবক? কিন্তু কই, মনে পড়ে না তো, ওকে কোথাও কোন সময় দেখেছে বা পরিচয় ছিলো তার সঙ্গে!

বেশি ভাবতে গেলেই নূরীর মাথা টনটন করে ওঠে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করলো নূরী। গত রাতের কথা স্মরণ হলো। যুবকটার জন্য মনটা হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়লো। বনহুরকে চিনতে না পারলেও ওর জন্য মায়া হলো নূরীর। কিন্তু কেমন যেন সহ্য করতে পারতো না সে ওকে।

দূর থেকেই নূরী বনহুরকে দেখতো, সুন্দর লাগতো ওকে। ভালো লাগতো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো, কেবল সে কাছে এলে তার বুক কেমন যেন দুরু দুরু করে কাঁপতো। নূরী কোনো সময় নিজে বনহুরের কাছে যেতো না বা কথা বলতো না। একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে কি কথা বলবে সে।

গত রাতের কথা মনে করে নূরীর অনুশোচনা হলো। ব্যথার খোঁচা লাগলো মনের কোণে। দরজা খুলে এ ঘরে প্রবেশ করলো নূরী। তাকিয়ে দেখলো, দুগ্ধফেনিল শুভ্র বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে বনহুর।

ভীতা হরিণীর মত লঘু পদক্ষেপে পা পা করে এগিয়ে এলো সে বনহুরের বিছানার পাশে!

মেঝেতে পড়ে থাকা বনহুরের স্লিপিং গাউনখানা স্পর্শ করতেই নূরীর সমস্ত শরীরে একটা অভুতপূর্ব শিহরণ জাগলো। বুকে চেপে ধরে–মুখে গালে লাগালো। তারপর তুলে রাখলো আলনায়।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে।

মনের মধ্যে আশঙ্কা জাগলো নূরীর, হঠাৎ যদি জেগে ওঠে–তখন কি হবে, পালাবার পথ পাবে না সে। –যেমন মন্থর গতিতে এসেছিলো তেমনি তাড়াতাড়ি চুপি চুপি বেরিয়ে গেলো নূরী।

আজ একটু বেলা করে ঘুম ভাঙলো বনহুরের।

ইয়াসিন অনেকক্ষণ চা টেবিলে রেখে শিয়রে দাঁড়িয়েছিলো। বার দুই ডেকেও ছিলো সে, কিন্তু ঘুম ভাঙলো না বনহুরের।

গোটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছিলো, তাই জাগতে এত বেলা হয়েছিলো।

ঘুম ভাঙতেই বললো ইয়াসিন–সাহেব, একজন ভদ্রলোক আপনাগো লগে দেখা করতে আইছেন।

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে থেমে পড়লো বনহুর, বললো–কোথায় তিনি?

বসবার ঘরে বইসেছেন।

আচ্ছা, চলো দেখি।

চা যে ঠাণ্ডা অইয়া যাইবো?

হতে দাও। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, স্লিপিং গাউনটার দিকে হাত বাড়াতেই মনে পড়লো, ওটা কাল মেঝেতে পড়েছিলো–আলনায় রাখলো কে? তবে কি ইয়াসিন ওটা উঠিয়ে রেখেছে? স্লিপিং গাউনটা হাতে নিয়ে পরতে পরতে বললো বনহুর–ইয়াসিন, এটা তুমি উঠিয়ে রেখেছিলে?

মাথা চুলকে বলে ইয়াসিন–না সাহেব, ওটা আলনাতেই ছিলো।

বনহুর আর কোনো কথা না বলে একটু অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো–দু'কাপ চা ড্রইংরুমে পাঠিয়ে দিও।

আচ্ছা সাহেব।

বনহুর ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই অবাক হলো, অরুণ কুমার সেন বসে আছে তার প্রতীক্ষায়।

বনহুর আদাব জানালো।

অরুণ কুমার বনহুরের আদাব গ্রহণ না করেই বললো-মিঃ চৌধুরী, আপনাকে সকাল বেলা বিরক্ত করলাম, করতে বাধ্য হলাম।

হেসে আসন গ্রহণ করলো বনহুর। বললো-হঠাৎ কি মনে করে এলেন মিঃ সেন?

অরুণ কুমার গম্ভীর মুখে বসে ছিলো, গম্ভীর কণ্ঠেই বললো- একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বলুন? প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুর অরুণ কুমারের মুখের দিকে।

অরুণ কুমার কক্ষে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো-মিঃ চৌধুরী, আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান.....

বনহুর বললো-ভূমিকার দরকার নেই, বলুন?

বনহুরের কথায় অরুণ কুমারের মুখমণ্ডল মুহূর্তে রাঙা হয়ে পরক্ষণেই স্বাভাবিক হলো। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো সে-আপনি জানেন আমি মিস রায়কে ভালবাসি।

বনহুরের মুখোভাবে কিছুমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না। স্বচ্ছকণ্ঠে বলে সে-এ কথা শোনাবার জন্যই কি আপনি.....

হাঁ মিঃ চৌধুরী, শুধু এ কথা শোনাবার জন্যই আমি এই সাত সকালে ছুটে এসেছি। জানি আপনি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, অন্য সময় আপনাকে পাওয়া মুশকিল, তাই....

তাই আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন মিস রায়কে ভালোবাসেন কথাটা জানাতে!

হাঁ তাই। অরুণ কুমারের মুখমণ্ডল অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

কাজেই আমি যেন আপনার পথে বাধার সৃষ্টি না করি, তাই না? বললো বনহুর।

এমন সময় ইয়াসিন ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করলো।

ট্রে টেবিলে নামিয়ে রাখতেই বনহুর এক কাপ চা অরুণ কুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো-নিন।

চা আমি খাই না। বললো অরুণ কুমার।

বনহুর একটা কাপ হাতে উঠিয়ে নিতে নিতে মুখ নীচু করে একটু হাসলো। তারপর কাপে চুমুক দিয়ে বললো-ভয় নেই, আপনার চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবো না।

ধন্যবাদ। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো অরুণ কুমার।

বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো সে। পরক্ষণেই বাইরে মোটর স্টার্টের শব্দ হলো।

বনহুর আপন মনেই হেসে উঠলো–হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ...

ইয়াসিন সে হাসির শব্দে ছুটে এলো।

নূরীও ঘরে বসে সে হাসির শব্দ শুনতে পেলো, চমকে উঠলো সে।

বনহুরের হাসি শেষ হতেই কক্ষে প্রবেশ করলেন প্রযোজক আরফান উল্লাহ–গুড মর্নিং মিঃ চৌধুরী!

বনহুরের হাসির রেশ তখনও ড্রইংরুমের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আরফান উল্লাহকে দেখে জবাব দিলো–গুড মর্নিং, আসুন!

আরফান উল্লাহ তাঁর বিরাট বপু নিয়ে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বালির বস্তার মত ধপ্ করে বসে পড়লেন।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়েছিলো, পুনরায় আসন গ্রহণ করলো। একটা প্রশ্ন উঁকি দিলো বনহুরের মনে। রাতেই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে, তাছাড়া স্বয়ং আরফান উল্লাহই তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন অথচ ভোরেই আবার এমন কি প্রয়োজন যার জন্য তিনি ছুটে এসেছেন তার কাছে।

বনহুর লোকমুখে শুনেছে, নিজেও গোপন অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছে–আরফান উল্লাহ শুধু এক চলচ্চিত্র ব্যবসা নিয়েই থাকেন না, তাঁর আরও বিভিন্ন কারবার আছে। শুধু ছবিই তাঁকে লাখ লাখ টাকা এনে দেয় না, এমন কিছু গোপনীয় ব্যবসা তিনি করেন, যা তাঁকে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছে।

আরফান উল্লাহ আসন গ্রহণ করে বললেন–আমার কন্যা মিস্ আতিয়া আজ আপনার এখানে আসবে।

কথাটা শুনে মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও মুখোভাব প্রসন্ন রেখে বললো বনহুর–আমার পরম সৌভাগ্য মিঃ উল্লাহ। কিন্তু উনি কষ্ট করে না এসে, বরং আমিই....

ভেবে দেখলাম তা হয় না, আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, কাজেই আতিয়া নিজেই আসবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে।

ধন্যবাদ। কিন্তু কবে আসবেন উনি?

সে কথা জানাবার জন্যই আমি এলাম মিঃ চৌধুরী, আপনি তাকে আসার অনুমতি দিলেই সে.....

ছিঃ ছিঃ, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন মিঃ উল্লাহ! তার বাড়ি, তিনি যখন খুশি আসতে পারেন।

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। শুনে খুশি হলাম মিঃ চৌধুরী।

বনহুর ইয়াসিনকে ডাকলো–ইয়াসিন?

ইয়াসিন এসে দাঁড়ালো–জ্বী সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে আরফান উল্লাহর উপর নজর পড়তেই বিবর্ণ হলো ইয়াসিনের মুখমণ্ডল। লম্বা সালাম ঠুকে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো–ইয়াসিন, চা-নাস্তা নিয়ে এসো।

আরফান উল্লাহ ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন–মাফ করবেন, এইমাত্র নাস্তা করে এসেছি।

শুধু এক কাপ চা।

তা-ও না।

আচ্ছা, তাহলে উনি...মানে আপনার কন্যা মিস আতিয়াকে কবে কখন নিয়ে আসছেন? আমার এবার একনাগাড়ে ক'দিন সুটিং আছে কিনা!

এ ক'দিন কি জ্যোছনা রায়ের সঙ্গেই আপনার কাজ হবে?

সে কথা এখনও মিঃ নাহার আমাকে সঠিক জানাননি।

আচ্ছা। উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–গুড বাই!

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিংসযোগ করে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালো। ভোর হতে না হতে পর পর দু'জন ব্যক্তির আগমন–একজন তার পথ হতে সড়ে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ, অপরজন তাকে কন্যার সঙ্গে পরিচিত করার জন্য আগ্রহশিল।

আজ বনহুরের কোন সুটিং ছিলো না, গোটা দিনটা তার হাতে। বই পড়ে, শুয়ে থেকেও সময় কাটতে চায় না তার। কয়েকবার নূরীর কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখেছে বনহুর–নূরী আপন মনে বসে আছে, কখনও বা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্য আকাশের দিকে। এত কাছে নূরী, তবু যেন কত দূরে। বনহুরের বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

বিকেলে বনহুর বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কাপড় পরা তার হয়ে গেছে, চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল, এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

হঠাৎ পাশে শব্দ শুনে ফিরে তাকায় বনহুর, বিস্ময়ে বলে ওঠে–তুমি!

নূরী আজ এই প্রথম স্বেচ্ছায় এসেছে বনহুরের পাশে।

বনহুর বললো–কিছু বলবে?

নূরীর ঠোট দু'খানা কেঁপে উঠলো, কিছু বলতে চায় সে।

বনহুর ঝুঁকে পড়লো নূরীর মুখের কাছে–বলো, বলো নূরী? নূরী বনহুরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বনহুর খপ্ করে ধরে ফেললো ওর হাতখানা–নূরী যেও না।

ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে। নূরী বনহুরের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু বনহুরের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলো না।

বনহুর বললো–কি বলতে চাও নূরী, বলো?

নূরী ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো, বললো–আমাকে ছেড়ে দিন।

নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো, বলো কি বলতে এসেছিলে তুমি?

আপনি চলে গেলে একা একা আমার বড্ড খারাপ লাগে।

নূরী!

বনহুর খুশির আবেগে নূরীকে টেনে নিলো কাছে। এই প্রথম নূরীর মুখে স্বাভাবিক স্বর শুনতে পেলো। আবেগভরা কণ্ঠে বললো বনহুর নূরী, নূরী...আমার নূরী। বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

নূরী বনহুরের বাহুবন্ধনে ঘেমে উঠলো।

পালাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লো সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। পরক্ষণেই ইয়াসিনের কণ্ঠস্বর–সাহেব, সাহেব, মালিক আইসেছেন–মালিকের মাইয়াও আইসেছেন।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

নূরী ছাড়া পেয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। বনহুর বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে।

ইয়াসিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো, বললো–বসবার ঘরে তারা বইছেন।

বনহুর এগিয়ে গেলো ড্রইংরুমের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে টাইটা ঠিক করে নিলো বনহুর।

আরফান উল্লাহ এসেছেন তাঁর কন্যা আতিয়াকে নিয়ে পরিচয় করাতে। কিন্তু আজ কতদিন হলো এসেছে সে এই বাড়িতে–কই, আতিয়া তো একদিনও এলো না, অথচ আরফান উল্লাহ কন্যার গল্পে পঞ্চমুখ–সে নাকি তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশিল!

বনহুরও কম আগ্রহান্বিত নয় আতিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

যার এত আছে, বাড়ি-গাড়ি, নিজস্ব স্টুডিও, ইণ্ডাস্ট্রি আরও কত কি, না জানি সে কেমন!

যে বাড়িটাতে বনহুর এখনও বসবাস করছে, সে বাড়িও তো তার। বাড়িটার সৌন্দর্য বনহুরকে মুগ্ধ করেছিলো। বনহুর কল্পনায় বাড়ির অধিনায়িকার যে ছবি মনের পর্দায় এঁকে রেখেছিলো তা মনোমুগ্ধকর এক নারীর।

এ বাড়িতে আসবার পর হতে বনহুরের ইচ্ছা বাড়ির অধিনায়িকার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কিন্তু আরফান উল্লাহ কেন যে তাঁর কন্যাকে এতদিনেও আনলেন না এবং তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না বুঝতে পারে না বনহুর।

আজ বনহুর অত্যন্ত আগ্রহশিল হয়ে প্রবেশ করলো ড্রইংরুমে।

রুমে প্রবেশ করেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর। সম্মুখস্থ সোফায় বসে আছেন আরফান উল্লাহ, পাশে একটা তরুণী–পিপে বা তেলের জালা বললেও ভুল হবে না! তরুণীর গায়ের রঙ আবলুসের মত কালো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মেমদের মত বক করে ছাঁটা।

বনহুর প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো–হ্যালো মিঃ উল্লাহ?

আরফান উল্লাহ হেসে বললেন–মিঃ চৌধুরী, এ আমার কন্যা মিস আতিয়া। আর উনি মিঃ চৌধুরী।

বনহুর হাত তুলে বললো–আদাব!

আতিয়া হাসলো একটু, যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকালো।

বনহুর জীবনে বহু নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু মিস আতিয়ার মত নারী সে কোনোদিন দেখেছে কিনা সন্দেহ।

আতিয়াই কথা বললো প্রথম–বসুন।

বনহুর থ' মেরে গিয়েছিলো, বসবে না দাঁড়িয়ে থাকবে, না আর একবার অন্তপুরে প্রবেশ করে নিজেকে স্বচ্ছ করে আসবে, ভেবে পাচ্ছিলো না।

এমন সময় শুনলো আতিয়ার চিকন বাঁশির মত সুর–বসুন।

বনহুরের এই বুঝি প্রথম কোনো নারীর সামনে হকচকিয়ে যাওয়া। আসন গ্রহণ করলো বনহুর। কি বলবে বা কি বলে কথা শুরু করবে ভেবে পেলো না। নিজের অজ্ঞাতেই বার কয়েক দৃষ্টি তার চলে গেলো মিস আতিয়ার মুখের দিকে।

সর্বনাশ! এমন মেয়েও জন্মে পৃথিবীতে। বনহুর হাঁপিয়ে উঠছিলো।

আরফান উল্লাহই কথা বললেন–মিঃ চৌধুরী, আপনি বুঝি বাইরে বেরুচ্ছিলেন?

হাঁ, মানে একটু কাজ আছে·বাইরে কিনা...বনহুর অবশ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে মিঃ আরফান উল্লাহ ও তাঁর কন্যা মিস আতিয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু হলো বিপরীত, আতিয়া আনন্দধ্বনি করে উঠলো–কোথায় যাবেন, চলুন না আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

হাঁ ঠিক বলেছো মা, আর তাঁর যখন বাইরে কাজ আছে তখন তাঁকে আটকে রাখা ঠিক হয় না। তুমি যাও তাঁকে তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসোগে। আর একদিন এসে বসা যাবে।

বনহুর মনে মনে প্রমাদ গুণলো, সবে পরিচয় তাতেই এত-সর্বনাশ হয়েছে এবার! এতদিন পরিচয় না ঘটে ভালই ছিলো।

বনহুর বললো–একটু চা-নাস্তা.....

আরফান উল্লাহ বললেন–তা আতিয়া তো কোনোদিন আসেনি। বুঝতেই পারছি, আপনি ছাড়বার পাত্র নন, বেশ, বলুন আনতে।

বনহুর ডাকলো–ইয়াসিন?

নিকটে কোথাও ছিলো ইয়াসিন। ছুটে এসে হাত জুড়ে দাঁড়ালো–সাহেব, আমাকে ডাকতেছেন।

হাঁ, চা-নাস্তা নিয়ে এসো।

ইয়াসিন চলে যাচ্ছিলো, আরফান উল্লাহ বললেন–দেখেশুনে ধীরে সুস্থে চা-নাস্তা তৈরি করে আনবি।

ইয়াসিন মাথা দুলিয়ে বললো–জ্বী আচ্ছা। চলে গেলো সে। আরফান উল্লাহ বললেন–জানেন, আতিয়া যেমন তেমন জিনিস খেতে পারে না। ছিমছাম আর পরিষ্কার জিনিস ওর পছন্দ।

হাঁ,. তা তাঁকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি মিঃ উল্লাহ।

কি আর বলবো মিঃ চৌধুরী, এই একটি মাত্র মেয়েই আমার সম্বল–ওর জন্যই সবকিছু।

তা আমি জানি। বললো বনহুর।

জানেন আপনি? হাঁ, আর জানবেনই না বা কেন? সবাই জানে আতিয়া ছাড়া আমার সবকিছু অন্ধকার।

এক মেয়ে যখন তখন তো হবেই।

দেখুন মিঃ চৌধুরী, আতিয়ার সুখের জন্য কি না করেছি।

আমি সব অবগত আছি মিঃ উল্লাহ।

বনহুর কথা যতই সংক্ষিপ্ত করে আনতে চায় ততই আরফান উল্লাহ চান কথা বাড়িয়ে লম্বা করে আনতে ছোটবেলায় মা মরা মেয়ে, কত কষ্ট করেই না মানুষ করেছি! আতিয়া আমার ছেলে-মেয়ে উভয়ই। মেয়েটা আমার লক্ষ্মী-যেমন আদর্শবতী, তেমনি জ্ঞানবতী, রুচিশিলা, দেখছেন না এ বাড়িটা আমার আতিয়ার রুচিমতেই তৈরি করা হয়েছে।

পিতার প্রশংসায় আতিয়া খুশিতে ডগমগ। মুখোভাবে একটা অহেতুক লজ্জাবোধ ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে শাড়ির আঁচলখানা দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো, আসলে সত্যিই ছিঁড়বার জন্য নয়-লজ্জায়।

বনহুর চোখ তুলে তাকাতেই আতিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, ক্ষুদে পিটপিটে আঁখি দু'টিতে যেন ঝরে পড়ছে অফুরন্ত প্রেম নিবেদন।

অসহ্য, অসহ্য-বনহুরের দস্যুমন বিষিয়ে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যে।

ইয়াসিন আজ যেন একেবারে কুঁড়ে বনে গেছে,. চা-নাস্তা আনতে এত বিলম্ব করছে কেন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো-দেখি ইয়াসিন এমন দেরী করছে কেন?

আরফান উল্লাহ বলে ওঠেন-আসতে দিন, এত তাড়া কিসের?

আমার একটু শিগ্র যেতে হবে কি না......

তা আতিয়া আপনাকে পৌঁছে দেবে, মা আতিয়া নিজেই ড্রাইভ জানে..

না, না, তাঁকে কষ্ট করতে হবে না, আমার ড্রাইভার আছে।

আতিয়া হেসে বললো-এতে আমার কোন কষ্ট হবে না মিঃ চৌধুরী।

হাঁ, বরং আতিয়া এসব কাজে আনন্দ পায়।

বনহুর স্বাভাবিক মানুষ নয়, তার কঠিন মন, কঠিন হৃদয়, অল্পে সে কোনোদিন কাবু হয় না, আজ বনহুর নাচার হয়ে পড়লো যেন। বাপ আর মেয়ের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার উপায় খুঁজতে লাগলো।

এমন সময় ইয়াসিন ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করলো।

আরফান উল্লাহ বললেন-নাও মা, আরম্ভ করো-উনি আবার বাইরে যাবেন....

হাঁ, আরম্ভ করুন মিস আতিয়া।

আপনি নেবেন না?

এইমাত্র ওসব সেরে নিয়েছি।
আরফান উল্লাহ ততক্ষণে খেতে শুরু করেছেন।
আতিয়াও খেতে আরম্ভ করলো।
বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো পিতা ও কন্যার মুখের দিকে।
খেতে খেতে বললেন আরফান উল্লাহ–চমৎকার নাস্তা তৈরি করেছিস ইয়াসিন।
ইয়াসিন হাত কচলাতে লাগলো।
বনহুর ততক্ষণে সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো।
আরফান উল্লাহ এবার খেতে খেতে বনহুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন–জানো মা আতিয়া, মিঃ চৌধুরী শুধু দেখতেই অপূর্ব নন, তাঁর অভিনয়ও অদ্ভুত।
কই, একদিনও তুমি আমাকে সুটিং দেখতে আনলে না?
এবার তো মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হলে, যখন খুশি এসো–উনাকে সঙ্গে করে ষ্টুডিওতে গিয়ে কত সুটিং দেখবে দেখো..কি বলেন মিঃ চৌধুরী, সত্যি কি না?
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই–কিন্তু আমি তো, মানে সব সময় বাড়ি থেকে সুটিংয়ে যাই না, কখনো বাইরে থেকেই চলে যাই.....
বনহুর যতই যা বলুক আরফান উল্লাহ ও আতিয়ার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল।
শেষ পর্যন্ত আতিয়ার গাড়িতে বনহুরকে বেরুতে হলো। কিন্তু যাবে কোথায়? সত্যি বাইরে তো আজ তার কোনো কাজ নেই। বনহুর বেরুচ্ছিলো হয় ক্লাব বা কোনো লেকের ধারে কিংবা পার্কে যাবার জন্য।
আতিয়া স্বয়ং ড্রাইভ করছে। পাশের আসনে বনহুর।
গাড়ি জন মুখর রাজপথ বেয়ে চলেছে।
আতিয়া বললো–কোথায় যাবেন বললেন না যে?
যে কাজ ছিলো এখন গিয়ে আর হবে না, কোথায় যাই ভাবছি।
বড় দুঃখের বিষয় মিঃ চৌধুরী, আপনার কাজটা আমাদের জন্যই হলো না।
আতিয়ার থ্যাবড়া মুখে চিকন সুর বড় বেখাপ্পা লাগছিলো। বনহুর ভেতরে ভেতরে রাগলেও মুখে হাসি টেনে বললো–না না, তেমন জরুরী কাজ নয়, তা এখন কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? বাসায় ফিরে যাওয়া যাক, কেমন?

আতিয়া বলে উঠলো-মিঃ চৌধুরী, আপনি এরই মধ্যে ফিরতে চান? কিন্তু কেন?

ভাল লাগছে না।

প্লিজ মিঃ চৌধুরী, চলুন পার্কে যাই।

বনহুর ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলো, কিন্তু মুখোভাবে তা প্রকাশ না করে ভ্রু কুঁচকে বললো-পার্কে?

কিংবা লেকের ধারে?

না!

চলুন না, প্লিজ.....

বনহুর গাড়ির মধ্যে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, বললো সে-চলুন যেখানে আপনার মন চায়।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ চৌধুরী, থ্যাঙ্ক ইউ, নির্জন লেকের ধারেই ভাল লাগবে এখন।

বনহুর কোনো কথা বলে না, নিশ্চুপ বসে থাকে স্থবিরের মত। লেকের ধারে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো আতিয়া-আসুন মিঃ চৌধুরী।

আতিয়া বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো-চলুন।

বনহুর সুবোধ বালকের মত গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

আতিয়ার হাতের মুঠায় বনহুরের বলিষ্ঠ হাতখানা ঘেমে উঠলো যেন, একটা মাংসপিণ্ডের মধ্যে তার হাতখানা যেন বসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

লেকের ধারে এসে দাঁড়ালো আতিয়া-পাশে বনহুর। বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো আতিয়া-কেমন লাগছে আপনার?

আতিয়ার প্রশ্নে বনহুরের সারা শরীর জ্বালা করে উঠলো, দাঁতে দাঁত পিষলো, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বললো-স্বপ্নময়, অপূর্ব!

সত্যি মিঃ চৌধুরী, এটা আপনার মনের কথা?

মনের নয়, অন্তরের।

বনহুরের কথায় আতিয়ার চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। প্রেমে ঢল ঢল হয়ে পড়লো আতিয়া। বনহুরের হাত ধরে বললো-ঠাট্টা করছেন না তো?

ছিঃ ঠাট্টা করবো আপনার সঙ্গে, কি যে বলেন!

দেখুন মিঃ চৌধুরী, সবাই আমার উপরের চেহারাটা দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে-কেউ আমার মনের সন্ধান জানে না বা নেয় না। আসুন ওদিকে গিয়ে বসি.....বললো আতিয়া।

বনহুর স্বপ্নগ্রস্তের মত অনুসরণ করলো তাকে। লেকের ধারে একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসলো আতিয়া। বনহুরকে হাত ধরে বসিয়ে দেয় নিজের পাশে।

আবেগভরা কণ্ঠে বললো আতিয়া– মিঃ চৌধুরী, ওরা জানে না আমারও হৃদয় আছে, প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা সব আছে...তবু..আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না। কথা বলতে বলতে কণ্ঠ ধরে আসে আতিয়ার!

বনহুরের মনে একটা আঘাত করে। চোখ তুলে তাকায় বনহুর আতিয়ার মুখের দিকে।

আতিয়ার মুখটা বেদনায় আরও বিকৃত দেখাচ্ছে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আতিয়া রুমাল দিয়ে নিজের চোখের পানি মুছে ফেললো, তারপর বললো আবার–অনেকেই আমার ঐশ্বর্যের লোভে আমাকে বিয়ে করতে এসেছে কিন্তু আমাকে দেখেই তারা পালিয়ে গেছে। আমি কি ক্ষতি করেছি তাদের, কেন তারা এভাবে চলে যায়...দু'হাতে মুখ ঢেকে আবার উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠে আতিয়া।

বনহুরের বুকের মধ্যে তখন প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

বৈচিত্রময় জীবন বনহুরের। এ বয়সে সে অনেক অবস্থায় পড়েছে। কিন্তু আজকের মত অবস্থা বুঝি তার জীবনে কোনোদিন আসেনি! কি বলবে, কি কি বলে সান্ত্বনা দেবে বনহুর ওকে, ভেবে পায় না।

কান্নার আবেগে আতিয়ার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আতিয়ার দিকে। একটু প্রেম-ভালবাসা স্নেহ বই তো নয়-----ক্ষতি কি, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে তাকে ছবির জন্য অভিনয় করতে হচ্ছে, আর একটি প্রাণের জন্য সে পারবে না একটু স্বার্থ ত্যাগ করতে? ছবির জন্য তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে আর এখানে করতে হবে একটা অবলা নারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য...বনহুর মনস্থির করে নেয়।

বনহুর হাত রাখলো আতিয়ার পিঠে–কাঁদবেন না।

মুহূর্তে আতিয়ার কান্না থেমে গেলো, একটা আনন্দময় মধুর হাসি ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে, গদগদ কণ্ঠে বললো–মিঃ চৌধুরী, আপনি কত ভাল!

বনহুর এবার রুমাল দিয়ে আতিয়ার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো–মিস আতিয়া, আপনার মনের ব্যথা কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পেরেছি।

আতিয়া বনহুরের হাতখানা নিবিড়ভাবে টেনে নেয়, গালে-ঠোঁটে ঠেকিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বলে–মিঃ চৌধুরী!

বনহুর নিজের হাতখানা আতিয়ার হাতের মধ্যে ছেড়ে দেয়, ইচ্ছা করেই টেনে নেয় না সে।

দস্যু হলেও বনহুরের হৃদয়ে ছিলো অপরিসীম দয়া। লক্ষ লক্ষ টাকা বনহুর ডাকাতি করে, আবার তেমনি বিলিয়ে দেয় দীন-দুঃখীদের মধ্যে অকাতরে। নরপিশাচ শয়তানদের যেমন সে শত্রু, তেমনি অসহায় বিপদগ্রস্তদের সহায়ও। এ দুনিয়ায় এমন কোনো কাজ নেই যা সে পারে না বা করেনি। শুধু একটু ভালবাসা কি আতিয়াকে দিতে পারবে না সে!

আতিয়া এখন অনেকখানি শান্ত স্থির হয়ে এসেছে।

বনহুর বললো এবার–চলুন ফেরা যাক।

আতিয়া বললো–আর একটু বসবেন না?

আজ আর নয়।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

এবার বনহুর স্বয়ং ড্রাইভ করে চললো!

আতিয়া বসে রইলো বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে।

বনহুরের দৃষ্টি গাড়ির সম্মুখভাগে, আতিয়া তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

❑

বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে জ্যোছনা রায়। জ্যোছনা রায়ের শরীরে আজও পূর্ব দিনের ড্রেস, সেই নববধূর পরিচ্ছদ। ললাটে চন্দনের টিপ, খোপায়, গলায়, হাতে ফুলের মালা। আজ ঘোমটায় মুখ ঢাকা নয় জ্যোছনা রায়ের। ঘোমটা আজ খসে পড়ে আছে কাঁধের ওপর।

বনহুরের শরীরেও বিবাহের ড্রেস।

গলায় ফুলের মালা, চোখে সুরমার রেখা, মুখে মিষ্টি হাসির ছোঁয়াচ।

অদূরে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনন্ত বাবু। সার্চ লাইটগুলো তৈরি রয়েছে পরিচালকের আদেশের অপেক্ষায়।

মাথার উপরে ঝুলছে শব্দ যন্ত্র।

সহকারী পরিচালকদ্বয় সেটের জিনিসগুলো ঠিক করে দিচ্ছিলো। মেহগনি খাটের উপর মালাগুলো লম্বা করে ঝুলছে। সেগুলো আর একটু নেড়েচেড়ে ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন পরিচালক নাহার চৌধুরী।

স্ক্রিপ্ট খুলে আর একবার নায়ক-নায়িকাকে বুঝিয়ে দিলেন তাদের ভূমিকা।

এবার নাহার চৌধুরী দ্রুত সরে এলেন ক্যামেরার পাশে, অনন্ত বাবুর পাশ কেটে নিজে একবার দেখলেন তাকিয়ে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন–রেডি! লাইট!

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বাবু ক্যামেরায় চোখ রাখলেন।

পুনরায় পরিচালকের উচ্চকণ্ঠ–ক্যামেরা,. সাউণ্ড...

বনহুর এবার জ্যোছনা রায়ের মুখটা তুলে ধরলো–রত্না!

লজ্জাভরা দৃষ্টি তুলে তাকায় রত্নার ভূমিকায় জ্যোছনা রায় বনহুরের মুখে–বলো!

আমি মুসলমান, আর, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা–এ বিয়েতে তুমি কি সুখী হবে রত্না? বললো মাসুদের ভূমিকায় বনহুর।

তোমাকে স্পর্শ করে আমি শপথ করছি, আমি......

জ্যোছনা রায়ের কথা শেষ হয় না, একটা সুতীক্ষ্নধার ছোরা এসে গেঁথে যায় জ্যোছনা রায়ের কাছে.....

পরিচালক নাহার চৌধুরী চীৎকার করে ওঠেন–কাট্।

সঙ্গে সঙ্গে সার্চ লাইটের আলো নিভে যায়।

ক্যামেরা থেকে সরে দাঁড়ান অনন্ত বাবু।

পরিচালক আনন্দধ্বনি করে ওঠেন–গুড!

পরবর্তী শিটের জন্য প্রস্তুত হন নাহার চৌধুরী।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, জ্যোছনা রায় বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে–সত্যি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।

বনহুর জ্যোছনার কথায় বলে–বেশ করেছেন কিন্তু।

নাহার চৌধুরী এগিয়ে আসেন–আপনারা উভয়েই চমৎকার অভিনয় করেছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় অদূরে ক্যামেরার ওপাশে শার্শীটার দিকে। কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে দেখা যায়–দু'টি চোখ শার্শীর ফাঁকে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো। পরক্ষণেই সরে গেলো চোখ দুটো।

বনহুর ওদিকে শার্শীটার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

জ্যোছনা রায় তাকালো সেইদিকে–কি দেখছেন?

বনহুর স্বাভাবিক হয়–কিছু না।

জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে বনহুরের আরো কয়েকটা শট নিলেন নাহার চৌধুরী। এবার ছুটি হলো জ্যোছনা রায়ের। নাহার চৌধুরী বললেন–মিস রায়, আপনি যেতে পারেন। আমাদের স্টুডিওর গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

হঠাৎ কেন যেন বনহুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো মিস রায়, আপনি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এই শটটার পর আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো। কারণ, আজ আর আমার কোনো কাজ নেই।

ধন্যবাদ মিঃ চৌধুরী। জ্যোছনা রায়ের কণ্ঠে একরাশ আনন্দ।

বনহুরের কাজ শেষ হতে বেশি বিলম্ব হলো না।

বনহুর আর জ্যোছনা রায় গাড়িতে এসে বললো।

এমন সময় হঠৎ বনহুর দেখতে পেলো–স্টুডিওর ছাদে একটা থামের আড়ালে সরে গেলো অরুণ কুমার সেন।

বনহুর গাড়িতে স্টার্ট দিলো কিন্তু মনটা তার কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলো। মনে পড়লো কিছু দিন আগের এক সকালের কথা। অরুণ কুমার এসেছিলো বনহুরের কাছে। কি উদ্দেশ্যে এসেছে বনহুর তা জানতো। তাই সে বলেছিলো; ভয় নেই অরুণ বাবু, আমি আপনার পথে কাঁটা হবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বনহুর সে কথাই ভাবছিলো।

জ্যোছনা রায় বনহুরকে গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাতে দেখে হেসে বললো–হঠাৎ আপনাকে বড় ভাবাপন্ন লাগছে মিঃ চৌধুরী?

জ্যোছনা রায়ের কথায় বনহুরের সম্বিৎ ফিরে আসে।

বললো বনহুর–মিস রায়, একটা কথা আপনাকে বলবো?

বলুন?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অরুণ কুমার সেন আপনাকে গভীরভাবে ভালবাসেন!

মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখোভাব স্বাভাবিক করে বললো সে–এ কথা তিনি আমাকে অনেকবার বলেছেন। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসতে পারিনি। মিঃ চৌধুরী, তিনি জানেন না, মনের ওপর কারও জোর চলে না।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলো জ্যোছনা রায়ের কথাগুলো।

বলে চলেছে জ্যোছনা রায়–অরুণ বাবু এমনও বলেছেন, তিনি আমার জন্য সব করতে পারেন, এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত দিতেও নাকি কুণ্ঠিত নন।

এত জেনেও আপনি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন মিস রায়?

আপনিও অবুঝের মতো কথা বললেন মিঃ চৌধুরী, কারণ অরুণ বাবুকে আমি শত চেষ্টা করেও ভালবাসতে পারিনি, পারবোও না।

কিন্তু ওর মনের দিকটা তো আপনার ভেবে দেখা উচিত।

তা হয় না মিঃ চৌধুরী।

কেন হয় না?

তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। এই যে আমার বাড়ি এসে গেছে। আসুন না আজ আমাদের ওখানে?

আজ নয়, আর একদিন আসবো।

অমন অনেকদিন বলেছেন, এসেছেন কোনোদিন। আসুন মিঃ চৌধুরী, এখানে আমার মা আর আমি থাকি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হলে মা অনেক খুশি হবেন।

অগত্যা বনহুরকে নামতে হলো।

জ্যোছনা রায়কে অনুসরণ করলো বনহুর। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো ওরা দু'জন। জ্যোছনা রায় বললো–আসুন, বসবার ঘরে নয়, একেবারে মায়ের ঘরে।

সেকি উনি.....

না না, উনি কিছু মনে করবেন না। আমার মা কিন্তু খুব ভাল–মা মা, দেখ কে এসেছেন!

প্রথমে কক্ষে প্রবেশ করলো জ্যোছনা রায়। বনহুর পেছনে। কক্ষে প্রবেশ করে সামনে তাকালো বনহুর, মধ্যবয়স্কা এক ভদ্র মহিলা বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের সামনে বসে বই পড়ছিলেন। জ্যোছনা রায়ের কণ্ঠস্বরে বইখানা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন। চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো পাওয়ার ওয়ালা চশমা। একটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরনে। কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতেও সিঁদুরের রেখা। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন ভদ্রমহিলা–জ্যোছনা।

হ্যাঁ মা, দেখ কাকে আজ ধরে এনেছি!

বনহুরের দিকে তাকিয়ে বললেন ভদ্রমহিলা–তোদের স্টুডিওর লোক বুঝি?

জ্যোছনা রায় বললো–উনি 'কুন্তিবাঈ' ছবির হিরো।

বসুন, আপনার বিপরীতেই বুঝি জ্যোছনা কাজ করছে?

ভদ্রমহিলা চশমাটি ঠিক করে নিয়ে বললেন আবার–জ্যোছনার মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। সত্যি বাবা, আজ আপনাকে দেখে অনেক খুশি হলাম।

বনহুর বুঝতে পারলো–জ্যোছনা রায় তার সম্বন্ধে আগেই মায়ের কাছে অনেক কিছু বলেছে। বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে চুপ রইলো।

কিন্তু বনহুর এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকার মত শান্ত লোক নয়। উসখুস করতে লাগলো তার মন। কিন্তু উঠি বললেন তো ওঠা হবে না। এসেছে যখন কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। কাজেই বনহুর বললো–আপনি আমাকে তুমি বলবেন।

হ্যাঁ ঠিক বলেছো বাবা, আপনি বলতে আমারও কেমন বাধছিলো। কিন্তু কথা দাও, এখন থেকে আসবে তুমি?

হঠাৎ পরিচয় হতেই ভদ্রমহিলা একেবারে নিজের করে নিলেন যেন।

এবার জ্যোছনা রায় হেসে বললো–দেখলেন তো মিঃ চৌধুরী, বলেছিলাম না আমার মা খুব ভাল। এবার থেকে মায়ের অনুরোধ ফেলতে পারবেন না নিশ্চয়ই।

বনহুর বললেন–পরিচয় যখন হলো, সুযোগ পেলেই আসবো।

না না, তা হবে না, ওসব সুযোগ টুযোগ বুঝি না। দেখো বাবা, একা একা থাকি, সময় কাটতে চায় না–জ্যোছনার সঙ্গে এলে অনেক খুশি হবো।

জ্যোছনা রায় উঠে দাঁড়ালো, সেও মায়ের পাশে আসনে বসে পড়েছিলো, বললো–যাই, একটু জলযোগের ব্যবস্থা করিগে।

বনহুর বাধা দিয়ে বললো–মোটেই না। উঠি আজ?

উঠি বললেই কি ওঠা হয় বাবা? এসেছো যখন তখন একটু যা হয় মুখে দিয়ে তবে যেতে হবে।

জ্যোছনা রায় ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে কক্ষ থেকে!

জ্যোছনা রায় বেরিয়ে যাবার পর ভদ্রমহিলা সোফায় আরও জেঁকে বসলেন, বললেন বনহুরকে–দেখো বাবা, জ্যোছনা আমার ঘরের লক্ষ্মী। ও যতক্ষণ বাইরে থাকে, মনে আমি এতটুকু শান্তি পাই না। কিন্তু কি করবো,

বাধ্য হয়েছি ওকে বাইরে পাঠাতে। তুমি হয়তো মনে করবে অভিনয় করানো আমাদের পেশা আসলে তা নয়, জ্যোছনার সখ–ও অভিনয় করবে।

বেশ তো, এটা মন্দ কি?

কিন্তু আমার ভাল লাগে না? শুধু ওর আর ওর বাবার ইচ্ছায়....

জ্যোছনা রায় এসে পড়ায় চুপ হলেন ভদ্রমহিলা।

বনহুরও কোনো কথা তুললো না এর পরে।

জলযোগের পর বনহুর বিদায় গ্রহণ করলো। জ্যোছনা রায়ের জননীর ব্যবহারে খুশি হলো বনহুর।

বিদায়কালে ভদ্রমহিলা বনহুরকে বারবার অনুরোধ জানালেন আবার আসতে।

বনহুর গাড়িতে চেপে বসলো, হঠাৎ পাশে হাতের কাছে একটা ভাঁজকরা কাগজ দেখতে পেলো সে।

বনহুর কাগজখানা পকেটে রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

জ্যোছনা রায় বনহুরকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলো। বনহুর তার অলক্ষ্যেই কাগজখানা সরিয়ে ফেলেছিলো।

বাড়ি ফিরে সর্ব প্রথম বনহুর আলোর কাছে গিয়ে সেই ভাঁজকরা কাগজখানা মেলে ধরলো। মাত্র কয়েক লাইন লেখা–

এত করে বলা সত্ত্বেও আপনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন না। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংঙ্কর। পুনরায় সাবধান করে দিচ্ছি।

–'অ'

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর।

হাসি থামিয়ে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলো সে, আতিয়া দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে, মুখে বিকৃত হাসি। হাতে একটা বেতের তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ। মূল্যবান শাড়ি এবং অলঙ্কারে সজ্জিত।

বনহুর তাকাতেই বললো আতিয়া–হ্যালো মিঃ চৌধুরী!

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–আপনি কখন এলেন।

কখন থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি মিঃ চৌধুরী। কথা বলতে বলতে আতিয়া বনহুরের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো।

বুঝতে পারলো বনহুর, আতিয়া এ বাড়িরই কোনো কক্ষে ছিলো এতক্ষণ।

বনহুর সংকুচিতভাবে একটু সরে দাঁড়ালো। নূরী যদি দেখে ফেলে কি যে মনে করবে!

আতিয়া বললো–আব্বা, আমাকে স্টুডিও থেকে ফোন করেছিলেন, আপনি নাকি বেশ কিছুক্ষণ হলো স্টুডিও থেকে বেরিয়েছেন।

মিঃ উল্লাহ স্টুডিওতে ছিলেন নাকি? কই, তার সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ হয়নি? বনহুর অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগলো।

আতিয়া বললো–আপনার বোন এখানে আছেন–কই তার সঙ্গে তো আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন না?

চোখ তুললো বনহুর–বোন। হাঁ আছে, কিন্তু তার শরীরটা তেমন ভাল নয়, কাজেই...

ও, উনি বুঝি অসুস্থ?

ঠিক অসুস্থ না, তবে মাথায় একটু–মানে–

মাথায় গণ্ডগোল আছে বুঝি আপনার বোনের?

হাঁ, একটা দুর্ঘটনায় তার মাথায় কিছুটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। চলুন ড্রইংরুমে গিয়ে বসি?

বনহুর এতক্ষণ আতিয়াকে এ ঘরে বসার জন্য অনুরোধ জানায়নি।

আতিয়া বললো–চলুন।

বনহুর যখন আতিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো তখন নূরী দরজার আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলো।

নূরীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, নতমুখে কি যেন ভাবতে লাগলো সে।

এর পূর্বে আরও কয়েকদিন আতিয়া এসে বনহুরকে জোর করে নিয়ে গেছে বাইরে। বনহুরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে টেনে নিয়ে যায়। নূরীর মনকে এ দৃশ্য কেমন যেন চঞ্চল করে তোলে, ভাবে কত কথা। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যায়। নূরী তখন শয্যায় শুয়ে থাকে চুপ করে।

ইয়াসিন অনেকদিন বলেছে, বেগম সাহেবা, আপনি অমন চুপ চাপ থাকেন কেন?

বাড়ির অন্যান্য চাকর বাকর প্রশ্ন না করলেও অবাক হয়েছে নূরীর নীরবতা লক্ষ্য করে।

কিন্তু কেউ জবাব পায়নি।

নূরী নির্বিকার পুতুলের মত গোটা দিন বসে থাকে নিজের শয়নকক্ষে। নূরীর দেখাশুনার জন্য যে মেয়েটাকে রাখা হয়েছিলো, সে সব সময় নূরীকে নাওয়া-খাওয়া করাতো–কোনো কোনো সময় বাগানে নিয়ে গিয়ে

বসতো, চুল আঁচড়ে দিতো, গল্প করতো, কিন্তু নূরী চিত্রার্পিতের ন্যায় গল্প শুনতো বা যা বলতো সেই কাজ করতো।

আতিয়ার সঙ্গে বনহুরের ক'দিন মেলামেশা লক্ষ্য করে নূরীর মধ্যে একটু যেন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। আর কেউ এটা লক্ষ্য না করলেও ধরা পড়ে গেলো বনহুরের কাছে।

বনহুর যখন আতিয়ার সঙ্গে ড্রইংরুমের দিকে যাচ্ছিলো তখন নূরীর ওপর তার চোখ দু'টো চলে গিয়েছিলো। একটা জিনিস বনহুর লক্ষ্য করেছিলো যা তার মনে এনেছিলো ক্ষীণ আশ্বাসবাণী। আতিয়ার সঙ্গে তার মেলামেশাটা নূরীর কাছে সন্তোষজনক নয় বলে মনে হয়েছিলো। একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো তখন বনহুরের ঠোঁটের কোণে।

ড্রইংরুমে আতিয়ার পাশে এসে বসলো বনহুর–মিস আতিয়া এত রাতে হঠাৎ কি মনে করে?

যদি বলি আপনাকে দেখতে?

কিন্তু....

না, কিন্তু নয়, কারণ এত রাতে আমি এমনিই আসিনি।

আপনি জানতেন আজ আমার সুটিং ছিলো। তবু জেনেশুনে কেন এত কষ্ট করে এসেছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মিঃ চৌধুরী, আব্বার মুখে শুনেছিলাম সন্ধ্যার পরই আপনার কাজ শেষ হবার সম্ভাবনা আছে, কাজেই...

কিন্তু শেষ নাও তো হতে পারে, এটাও আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিলো।

কি জানি মিঃ চৌধুরী, সব সময় আপনাকে মনে–আপনার পাশে থাকবার বাসনা আমার মনকে অস্থির করে রাখে।

আতিয়ার প্রেম গদ গদ কণ্ঠস্বরে বনহুরের মন বিষিয়ে ওঠে। ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকায় সে ওর মুখের দিকে।

বনহুর মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও আতিয়ার যাওয়া-আসা বেড়েই উঠলো দিনের পর দিন।

বনহুরকে নিবিড় করে পাবার জন্য আতিয়া যেন উম্মাদ হয়ে উঠলো। আরফান উল্লাহ কন্যাকে যোগাতে লাগলেন উৎসাহ আর প্রেরণা। মিঃ চৌধুরীকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করার এই একমাত্র উপায়। যেমন করে হোক তাকে কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেই তিনি যেন নিশ্চিন্ত হন।

একসঙ্গে কন্যার জামাতা লাভ এবং নিজের ছবির হিরো সংগ্রহ! কিন্তু বনহুর নির্বোধ নয়। প্রথম দিন আরফান উল্লাহর সঙ্গে পরিচিত হয়েই সে বুঝতে পেরেছিলো তার মনোভাব সুবিধার নয়। লোকটার উদ্দেশ্যমূলক কথাবার্তা তার মনে জাগিয়েছিলো সন্দেহের দোলা।

বনহুর সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো নিজের ব্যাপারে।

ইচ্ছা করলেই বনহুর আরফান উল্লাহ এবং নাহার চৌধুরীর নাগপাশ থেকে যে কোন মুহূর্তে মুক্ত হয়ে উধাও হতে পারতো। বনহুরকে আটকায় এমন কেউ নেই এ দুনিয়ায়, কিন্তু সে আপন ইচ্ছাতেই রয়ে গেছে, তা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নয়। ছবিতে-লক্ষ টাকা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আরফান উল্লাহ। শুধু অর্থের জন্যও নয়, পেছনে আর একটা ব্যাপার রয়েছে। বনহুর গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছে প্রযোজক আরফান উল্লাহ একজন অসৎ ব্যবসায়ী।

বনহুর ছবির কাজ শেষ করে টাকা নেবে এবং সেই সঙ্গে আরফান উল্লাহর অসৎ ব্যবসার অবসান ঘটাবে।

গভীর রাত।

একটা গাড়ি এসে থামে আরফান উল্লাহর বাড়ির পেছনভাগে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো একজন জমকালো আলখেল্লাধারী। সমস্ত শরীর কালো আলখেল্লায় ঢাকা। মুখে কালো মুখোশ। শুধু চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো আলখেল্লার ভেতরে।

আলখেল্লাধারী অতি কৌশলে পেছন প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে। একবার প্যান্টের পকেটে হাত রেখে রিভলবারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

সোজা এসে দাঁড়ালো আলখেল্লাধারী দোতলার পেছনের দিকে। অতি নিপুণতার সঙ্গে পাইপ বেয়ে উঠতে লাগলো উপরে।

যে কক্ষটার পাইপ বেয়ে আলখেল্লাধারী উপরে উঠলো সেই কক্ষের মধ্যে তখন আরফান উল্লাহ ও আর একজন লোক বসে অতি নিম্নস্বরে আলোচনা হচ্ছিলো।

আলখেল্লাধারী পাইপ বেয়ে একেবারে জানালার শার্শির পাশে এসে পৌছলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষ হতে ভেসে এলো আরফান উল্লাহর চাপা কণ্ঠ–আহমদ, আবার তোমাকে বলে দিচ্ছি–রাত একটায় গঞ্জপুর থেকে রওয়ানা দেবে, জোড়াপুলের উপর পৌঁছতে যেন রাত দু'টো হয়। কারণ, তখন ট্রাফিক পুলিশ জোড়াপুলের মুখ থেকে সরে পড়বে। তারপর নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাবে আমার গুদামে। সেখানে পৌঁছলে আর কোনো ভয় থাকবে না। সাবধান! কেউ যেন টের না পায়–ট্রাকের চিনির বস্তার মধ্যে সোনা আছে।

নাহি বাবু সাব, টের না পাবে। হামি লোক বহুৎ হুঁশিয়ার আছি! চিনির বস্তায় সোনা আছে–কেউ টের না পাবে।

আলখেল্লাধারীর চোখ দুটে জ্বলে উঠলো।

কক্ষে এবার শোনা গেলো–হামি এবার চলি?

যাও আহমদ, মনে রেখো–তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন।

হাসির শব্দ–হামাকে তা বলতে হবে না। সালাম বাবু সাব।

আরফান উল্লাহর কণ্ঠ –সালাম।

আলখেল্লাধারী যেমন এসেছিলো তেমনি পাইপ বেয়ে তর তর করে নেমে গেলো নিচে।

বাড়ির পেছন অংশে পৌঁছতেই আলখেল্লাধারী শুনতে পেলো মোটর ষ্টার্টের শব্দ। বাড়ির দক্ষিণ অংশে কোনো গোপন জায়গা আছে, যেখানে গাড়ি রাখলে সামনে থেকে কেউ দেখতে পায় না।

আলখেল্লাধারী যখন তার শব্দবিহীন গাড়িখানা নিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে পেছন দিকে আসছিলো, তখন বাড়ির সামনের গাড়ি বারান্দায় কোনো গাড়ি ছিলো না।

আলখেল্লাধারী গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দিলো।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো গাড়িখানা।

পরদিন।

রাত দুটো বাজবার কিছু বিলম্ব আছে।

আলখেল্লাধারী নিজের গাড়িখানা জোড়াপুলের অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে নেমে দাঁড়ালো। অন্ধকারে রেডিয়াম হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, এখনো দুটো বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকী।

শহর ছেড়ে প্রায় একশ মাইল দূরে এই জোড়াপুল। মধুগঙ্গার উপর দিয়ে ঝুলানো এই পুলখানা চলে গেছে গঞ্জপুরের দিকে। পুলটার ঠিক মাঝখানে একটা জোড়া রয়েছে, তাই এর নাম জোড়াপুল।

মধুগঙ্গা দিয়ে যখন বড় বড় নৌকা বা ষ্টিমার চলে তখন জোড়াপুলের জোড়া খুলে যায়।

পুলের দুই মাথায় দু'জন ট্রাফিক পুলিশ দণ্ডায়মান থাকে, তারাই পুলের জোড়া খুলে দেয়। পুলের দু'পাশে দুটো হ্যাণ্ডেলের মত জিনিস রয়েছে,

সেটা জোরে সামনে ঠেলে দিলে পুল স্বাভাবিক হয়ে যায়, আর পেছনে ঠেলে দিলে মাঝখান ফাঁক হয়ে যায়। তখন যে কোনো স্টিমার বা বড় বড় নৌকা পাল তুলে অনায়াসে এদিক থেকে সেদিক চলে যায়।

আলখেল্লাধারী এসে দাঁড়ালো পুলের সামনে যেখানে রয়েছে পুলের চাবিকাঠি।

ঠিক সেই মুহূর্তে মধুগঙ্গার ওপারে রাস্তায় দুটো লাইটের আলো তীরবেগে ছুটে আসছে জোড়াপুলের দিকে।

আলখেল্লাধারীর চোখ দুটোও জ্বলে উঠলো ঠিক ঐ দুটো লাইটের আলোর মতই।

স্পীডে এগিয়ে আসছে একটা ট্রাক।

এখানে হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে আলখেল্লাধারী। আর মাত্র কয়েক মিনিট–তাহলেই তার দক্ষিণ হাতখানা নুয়ে পড়বে একপাশে।

আলখেল্লাধারীর দৃষ্টি ঐ সার্চলাইটের আলোর ওপর স্থির হয়ে আছে।

গাড়িখানা সবেগে উঠে পড়লো জোড়াপুলের উপর। তীরবেগে এগিয়ে আসছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, জোড়াপুলের মাঝখান ফাঁক হয়ে গেলো আচম্বিতে।

ঝপ্ করে একটা শব্দ হলো।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বাতাসে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো মুহূর্তে।

পরক্ষণেই একটা অট্টহাসিতে মুখর হয়ে উঠলো মধুগঙ্গার তীর। আলখেল্লাধারী এবার হাসি থামিয়ে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হোসাইন দেখলেন তাঁর নামে একখানা জরুরী চিঠি এসেছে। মুখহাত না ধুয়েই খুলে ফেললেন চিঠিখানা। মাত্র দুটো লাইন লেখা আছে–

ইন্সপেক্টার, গত রাত দুটোয় জোড়াপুলের মাঝখানে
মধু গঙ্গায় একটি ট্রাক নিমজ্জিত হয়েছে। ট্রাকে
চিনির বস্তার মধ্যে বহু সোনা আছে। বিলম্ব না
করে উদ্ধার করুন।

–'অজ্ঞাত'

ইন্সপেক্টার মিঃ হোসাইন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর হাতে চিঠিখানা তখনও ধরা। মধুগঙ্গায় ট্রাক নিমজ্জিত, চিনির বস্তায় সোনা--- কয়েকবার পড়লেন মিঃ হোসাইন চিঠিখানা।

হাতমুখ ধোয়া বা নাস্তা খাওয়া কোনোটাই তাঁর হলো না, তখনই তিনি চিঠিখানাসহ ছুটলেন পুলিশ অফিসে।

সহকারী মকসুদ মিয়াকে তখনই আদেশ দিলেন কয়েকজন পুলিশ নিয়ে মধুগঙ্গায় জোড়াপুলের নিকটে যেতে। অল্পক্ষণ পর তিনি আসছেন বলে জানালেন।

হঠাৎ মধুগঙ্গায় জোড়াপুলের নিকটে কি প্রয়োজন ভেবে পান না মকসুদ মিয়া।

মিঃ হোসাইন আরও বলে দিলেন–তিনি পৌছবার পূর্বে কেউ যেন মধুগঙ্গায় না নামে।

মকসুদ মিয়া কোনো প্রশ্ন করতে পারলেন না, তিনি কয়েকজন পুলিশ নিয়ে রওয়ানা হলেন মধুগঙ্গার দিকে।

সহকারী মকসুদ মিয়া বিদায় হতেই মিঃ হোসাইন চিঠিখানা নিয়ে পুলিশ সুপারের নিকটে হাজির হলেন।

চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন–স্যার, চিঠির কথা সত্য মিথ্যা জানি না, তবু আমি আমার সহকারী মকসুদ মিয়াকে কয়েকজন পুলিশসহ মধুগঙ্গার তীরে পাঠিয়েছি। এবার কি করা যায় বলুন?

পুলিশ সুপার বেশ কিছুক্ষণ চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন–যতদূর বিশ্বাস চিঠির লেখা সত্য বলেই মনে হচ্ছে।

তাহলে আমি ডুবুরী নিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখবো?

নিশ্চয়ই দেখতে হবে।

পুলিশ সুপারের সঙ্গে যখন পুলিশ ইসপেক্টার মিঃ হোসাইন নিমজ্জিত ট্রাক, সোনা চিঠি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন, তখন বনহুর নিজের ড্রাইরুমে বসে চা পান করছিলো।

এমন সময় পাগলের মত এলোমেলো বেশে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ আরফান উল্লাহ–মিঃ চৌধুরী, সর্বনাশ হয়েছে, আমার সর্বনাশ হয়েছে--- মাথায় হাত দিয়ে ধপ্ করে সোফায় বসে পড়লেন তিনি।

বনহুর শশব্যস্তে ওঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–হঠাৎ কি হলো আপনার মিঃ উল্লাহ?

মিঃ চৌধুরী, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ হয়ে গেছে! আতিয়ার কোনো অমঙ্গল ঘটেনি তো? বনহুর চোখেমুখে আশংকাভাব টেনে কথাটা বললো।

আরফান উল্লাহ বললেন–না, না, আতিয়ার কোনো অমঙ্গল ঘটেনি মিঃ চৌধুরী।

তবে কি হলো?

দু'লাখ টাকা, দু'লাখ টাকা আমার চলে গেছে মিঃ চৌধুরী ও হো হো হো আকুলভাবে কেঁদে উঠলেন আরফান উল্লাহ।

বনহুর যেন কিছু বুঝতে পারলো না এমনি থ' বনে যায়।

আরফান উল্লাহর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে। গা ঘেমে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

আরফান উল্লাহ বললেন -কি করবো বলুন, কি করবো?

বলুন কি ঘটনা ঘটেছে? না বললে বুঝবো কি করে?

মিঃ চৌধুরী, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি---

হাঁ বলুন?

আমার দু'লাখ টাকার সোনা কাল মধুগঙ্গার বুকে নিমজ্জিত হয়েছে।

দু'লাখ টাকার সোনা। বনহুর যেন আকাশ থেকে পড়লো।

হ্যা হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরী শুনুন – কাল রাতে গঞ্জপুর থেকে এক ট্রাক বোঝাই চিনি আসছিলো---

চিনি।

হ্যাঁ , সে চিনির বস্তার ভেতরে ছিলো আমার দু'লাখ টাকার সো- না--- কথাটা তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এলো যেন।

বনহুর বললো- কি করে জানলেন সেগুলো মধুগঙ্গায় নিমজ্জিত হয়েছে?

ড্রাইভার --- মিঃ চৌধুরী, কোনো রকমে সাঁতার কেটে ড্রাইভার প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন চিন্তা করলো, তারপর বললো— ড্রাইভার প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে।

হাঁ, তার মুখেই সংবাদ পেলাম মিঃ চৌধুরী। এখন কি করি বলুন? কি করে আমার সোনাগুলো উদ্ধার করি?

বনহুর এবার শান্তকণ্ঠে বললো-ভয় নেই মিঃ উল্লাহ। মধুগঙ্গার পানিতে আপনার চিনির বস্তা দিয়ে সরবৎ তৈরি হলেও বস্তার মধ্যে সোনার দলা গলে যাবে না।

কিন্তু দিনের আলোতে কি করে এগুলো উদ্ধার করা যাবে? আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না--

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো গত রাতের আহম্মদ। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো-মিঃ উল্লাহ সাহেব, বহুত খারাপ বাত আছে!

আরফান উল্লাহ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো-কি খবর বলো, বলো আহম্মদ? ঐ খবরের পর আর কি খারাপ থাকতে পারে বলো?

হামাকে আপনি মধুগঙ্গার ধারে পাঠাইয়া এখানে আসিলেন। কিন্তু হামি যাইয়া দেখিলাম-বহুত পুলিশ মধুগঙ্গার জোড়াপুলে ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

পুলিশ!

হাঁ, পুলিশ। আরও দেখিলাম উহারা পানিতে নামিবার জন্য তৈরি হইতেছে।

আহম্মদের জামার আস্তিন চেপে ধরলেন আরফান উল্লাহ, আকুল কণ্ঠে বললেন–পুলিশ কি করে টের পেলো? আহম্মদ, পুলিশ কি করে টের পেলো?

বনহুর দু'চোখ কপালে তুলে বললো–সর্বনাশ তো তখন হয়নি, হলো এখন। পুলিশ যখন সন্ধান পেয়েছে তখন আর কোনো—

উ–পা–য় নেই! কথাটা টেনে টেনে হতাশার সুরে বললেন আরফান উল্লাহ।

আরফান উল্লাহকে তখন এমন দেখাচ্ছিলো যেন তার দেহে প্রাণ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন আরফান উল্লাহ –মিঃ চৌধুরী, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, শুধু আপনার ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস---

বলুন কি প্রয়োজন?

পুলিশ যখন জানতে পেরেছে তখন করবার আর কিছু নেই, কিন্তু কথাটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়, মানে সোনাগুলো যে আমার---

জানতে পারবে না মিঃ উল্লাহ। সোনাগুলোই শুধু হারিয়েছেন, আপনি বেঁচে গেছেন।

আরফান উল্লাহ বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরলেন— একথা শুধু আপনি জানলেন মিঃ চৌধুরী।

হাঁ, ভয় নেই কোন।

আরফান উল্লাহ যখন বনহুরের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন, তখন মনে হলো তার দেহে প্রাণ নেই, কোনো রকমে দেহকে টেনে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

পরদিন পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ পেলো গত দিনের সোনা উদ্ধারের খবরটা ঃ

পুলিশ কর্তৃক মধুগঙ্গা থেকে প্রচুর সোনা উদ্ধার ঃ নম্বরবিহীন একটি নিমজ্জিত ট্রাক ও কয়েকখানা বস্তা উদ্ধার করা হয়েছে।

শহরে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিলো। একি অদ্ভুত ঘটনা। ট্রাকই বা এলো কোথা হতে আর সোনাই বা এলো কি করে, কিন্তু এর জবাব কেউ দিতে পারলো না।

আরফান উল্লাহ বেশ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। দু'লাখ টাকা তার পানিতে ভেসে গেছে, কম কথা নয়। পুলিশের হাতে চলে যাওয়া মানে পানিতে ভেসে যাওয়ার মতই।

আরফান উল্লাহ ঝিমিয়ে পড়লেও একেবারে ভেঙে পড়লেন না। ভেঙে পড়লে তার চলবে কেন? মেরুদণ্ড সোজা করে আবার তিনি পা বাড়ালেন সামনের দিকে।

বিদেশিদের সঙ্গে বছরে তাঁর বেশ কয়েক লাখ টাকার গোপন কারবার চলতো। তাছাড়া অন্যান্য অনেক চোরা কারবার ছিলো আরফান উল্লাহর, কাজেই আরফান উল্লাহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেন।

এতগুলো টাকা বিনষ্ট হওয়ায় আরফান উল্লাহ ঝিমিয়ে পড়লেও তার অনুচর ও কর্মচারীরা নীরব ছিলো না। তারা ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

'কুন্তিবাঈ' ছবির সুটিং কয়েকদিন বিশেষ কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, আবার শুরু হলো।

সেদিন আউটডোর সুটিংয়ের জন্য একটা গ্রামাঞ্চলে যেতে হলো 'কুন্তিবাঈ' ছবির ইউনিটকে।

আজকের সুটিংয়ে খুব বেশি লোকজনের দরকার হবে না।

পরিচালক নাহার চৌধুরী, ছবির নায়ক মিঃ চৌধুরী, নায়িকা জ্যোছনা রায় এবং সহনায়ক বিশু সেন ও অন্যান্য লোক নিয়ে রওয়ানা দিলেন শহর ছেড়ে দশ মাইল দূরে একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে।

দু'খানা ট্যাক্সি আর একটা ট্রাক নিয়ে রওয়ানা দিলেন নাহার চৌধুরী।

সামনের ট্যাক্সিতে পরিচালক স্বয়ং এবং নায়ক-নায়িকা ও সহনায়ক।

মাঝখানে ইউনিটের বিভিন্ন লোক এবং খাবার জিনিসপত্র।

পেছনের ট্রাকে ক্যামেরা এবং অন্য আসবাবপত্র-যা ছবির জন্য প্রয়োজন।

শহর ছেড়ে গাড়িগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

ড্রাইভারের আসনের পাশে বনহুর আর জ্যোছনা রায় বসেছে।

পেছন আসনে নাহার চৌধুরী ও সহনায়ক বিশু সেন।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ জ্যোছনাকে বেশ গম্ভীর ভাবাপন্ন লাগছিলো, দু'একটা হুঁ না ছাড়া তেমন কোনো কথা আজ বলেনি জ্যোছনা রায়।

অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও বনহুর লক্ষ্য করেছিলো-হাস্যময়ী জ্যোছনা রায় আজ বেশ চুপচাপ।

এবার জিজ্ঞাসা করলো বনহুর-মিস রায়, এমন নিশ্চুপ রয়েছেন কেন?

জ্যোছনা রায় একটু হেসে বললো-না,কিছু না।

জ্যোছনা রায় মুখে 'কিছু না' বললেও মনের গহনে তার ঝড় বইছিলো। কারণ রওয়ানা দেবার পূর্বমুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। বিদায়ের কিছু পূর্বে জ্যোছনা রায় যখন তার বিশ্রামকক্ষে ড্রেস পরিবর্তন করছিলো ঠিক সে মুহূর্তে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো অরুণ কুমার।

দু'চোখে তার অসহায় দৃষ্টি।

জ্যোছনা রায় অরুণ কুমারকে দেখে আচম্বিতে চমকে ওঠে। দু'চোখে রাগ –ক্রোধ ঝরে পড়ে, বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেছিলো জ্যোছনা রায়–এখানে আপনি কার হুকুমে এসেছেন?

অরুণ কুমার বলেছিলো–জ্যোছনা, আমি কারও হুকুমে এখানে আসিনি, মনের আকর্ষণে ছুটে এসেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি।

এ কথা আরো অনেকবার আপনার মুখে আমি শুনেছি।

আজও বলছি জ্যোছনা আমার প্রতি সদয় হও!

না, যা হবার নয় তা কোনোদিন হবে না।

জ্যোছনা! অস্ফুট শব্দ করে উঠেছিলো অরুণ কুমার। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিলো–যদি তোমাকে কোনোদিন না পাই তবে –জানো কি হবে তোমার পরিণতি?

জানতে চাই না–যান, যান আপনি।

জ্যোছনা, মনে রেখো আমার হাত থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। যেখানেই যাবে তুমি, সেখানেই আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে–হয় তোমাকে পাবো, নয় তোমাকে এ দুনিয়া থেকে চির–বিদায় দেবো।

জ্যোছনা সে ভয়ে ভীত নয়।

তাই নাকি?

হাঁ, মরতে হয় মরবো, কিন্তু তবু আপনাকে---

জ্যোছনার মুখ চেপে ধরেছিলো অরুণ কুমার, কথা শেষ করতে পারেনি। সে মুহূর্তে বাইরে ভেসে উঠেছিলো নাহার চৌধুরীর কণ্ঠস্বর–হ্যালো মিস রায়, আপনার হলো ?

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ বাবু অদৃশ্য হলেছিলো ড্রেসিং টেবিলের আড়ালে।

নাহার চৌধুরীর কণ্ঠস্বর পুনরায় ভেসে এসেছিলো বাইরে থেকে –আসতে পারি?

শুষ্ক কণ্ঠে বলেছিলো জ্যোছনা রায় –আসুন।

হয়েছে আপনার?

হয়েছে।

চলুন।

নাহার চৌধুরীকে অনুসরণ করেছিলো জ্যোছনা রায়।

এখন বনহুরের পাশে বসে সে কথাই ভাবছিলো জ্যোছনা রায়। মনের মধ্যে তার ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছিলো। বারবার মনে পড়ছিলো অরুণ কুমারের কথাগুলো–যেখানেই যাবে তুমি সেখানেই আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে। হয় তোমাকে পাবো, নয় তোমাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় দেবো। --জ্যোছনা রায়ের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে।

পরিচালকের কণ্ঠস্বর–ঐ সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গাড়ি রাখো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্যোছনা রায়দের গাড়ি একটা বনানী ঘেরা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

পাশাপাশি তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

দু'খানা জিপ আর একটা ট্রাক।

'কুন্তিবাঈ' ইউনিট নেমে পড়লো জায়গাটায়।

বনহুর জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো আবার– বেশ জায়গাটা, না?

ছোট্ট একটা শব্দ করলো জ্যোছনা রায় হ্যাঁ।

অন্যদিন হলে হাসি–খুশি –আনন্দে চঞ্চল হরিণীর মত এতক্ষণ ছুটাছুটি শুরু করে দিতো জ্যোছনা রায়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল খুব প্রিয় স্থান জ্যোছনা রায়ের।

বনহুরের সঙ্গে এগুতে লাগলো জ্যোছনা রায়।

পরিচালক স্বয়ং তার অন্যান্য সহকারীকে নিয়ে স্থান নির্বাচনে আত্মনিয়োগ করলেন।

অন্যান্য সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

বনহুর ঘুরেফিরে জায়গাটা দেখছিলো।

হঠাৎ নজর চলে গেলো পাশে–কই, জ্যোছনা রায় নেই তো! গেলো কোথায়? চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো। দেখলো বনহুর –অদূরে একটি গাছের নীচে ঘাসের উপর বসে আছে জ্যোছনা রায়।

আরে আপনি এখানে! বনহুর গিয়ে দাঁড়ালো জ্যোছনা রায়ের পাশে।

জ্যোছনা রায় বললো–এখানে একটু ঠাণ্ডা মিঃ চৌধুরী, তাই বসলাম।

হাঁ, জায়গাটা বেশ আরামদায়ক।

সত্যি যেখানে জ্যোছনা রায় বসে পড়েছিলো, সে জায়গাটা একটা বকুল ফুলের গাছতলা। ফুলে ফুলে গাছটা যেন নুয়ে এসেছে একেবারে।

ফুরফুরে হাওয়ায় বকুলের মিষ্টি গন্ধ জায়গাটাকে যেন স্বর্গিয় করে তুলেছিলো।

বনহুর বিলম্ব না করে বসে পড়লো জ্যোছনা রায়ের পাশে। এদিক–ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো–সত্যি করে বলুন তো আজ আপনার কি হয়েছে?

বললাম তো–কিছু হয়নি।

মিথ্যে কথা। আর একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো বনহুর–আসার পূর্বে অরুণ বাবুর সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছিলো মিস রায়?

চমকে উঠলো জ্যোছনা রায়–আপনি কি করে জানলেন।
আমি সব জানি মিস রায়।
আশ্চর্য! আপনি তখন--
যদিও গাড়িতে ছিলাম তবুও --
মিঃ চৌধুরী।
মিস রায় অরুণ বাবু আপনাকে এমন কোনো কথা শুনিয়েছিলো যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর।
হাঁ, আপনার অনুমান মিথ্যা নয় মিঃ চৌধুরী। একটু চিন্তা করে বললো জ্যোছনা রায়–অরুণ বাবু আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলো–যেখানেই যাবে তুমি সেখানেই আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে।
কথাটা শোনামাত্র বনহুরের মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে একটা চিন্তারেখা, গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে–হুঁ।
জ্যোছনা রায় বললো আবার –মিঃ চৌধুরী, অরুণ বাবু আরও বললো–তোমাকে যদি না পাই, মনে রেখো–এ দুনিয়াতে তোমাকে বাঁচতে দেবো না।
বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–মিস রায়, এসব জানার পর আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন?
বলেছি মৃত্যুভয়ে জ্যোছনা রায় ভীত নয়। মরতে হয় মরবো তবু আপনাকে আমি গ্রহণ করতে পারবো না। কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে জ্যোছনা রায়।
বনহুর মুখে হাসি টেনে বললো–মিস রায়, কেন আপনি ওর প্রতি এত নারাজ?
এর কোনো জবাব দিতে পারবো না মিঃ চৌধুরী।
অরুণ বাবু বড়লোকের একমাত্র সন্তান–রূপ গুণ সব আছে তার। সুপুরুষ সে, অথচ জানি না কেন আপনি---
মিঃ চৌধুরী, আপনাকে আমি এর উত্তর দিতে রাজী নই। শুধু আজ নয়, সে আমার পেছনে বেশ কয়েক বছর ধরে ঘুরে ফিরছে।
আপনার প্রথমেই তাকে বলে দেওয়া উচিত ছিলো!
দিয়েছিলাম।
তবু?
হাঁ, তবুও সে সব সময় আমাকে বিরক্ত করতো।
বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে মেকআপ ম্যান ডাক দিলেন–আসুন মিঃ চৌধুরী, মিস জ্যোছনা রায়, আপনাদের এখন মেকআপ নিতে হবে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো-চলুন মিস রায়।
জ্যোছনা রায়ও উঠে পড়লো- চলুন।
ছবির কাজ শুরু হলো।
ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবু ক্যামেরার পাশে এসে দাঁড়ালেন।
সেনাপতি জয় সিংহের ভূমিকায় ভিলেন বিশু সেন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। পাশে রাজা পরশ রায়ের ভূমিকায় দেব শর্মা।
পরিচালক নাহার চৌধুরী চীৎকার করে বললেন-ক্যামেরা।
সঙ্গে সঙ্গে দেব শর্মা ও বিশু সেন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।
ক্যামেরা ঘোড়াসহ দেবশর্মা ও জয়সিংকে ধরে নিয়ে পেছনে সরতে লাগলো।
জয়সিংবেশি বিশু সেন এবার ঘোড়াসহ ক্যামরার সামনে এসে, দাঁড়িয়ে পড়লো। পাশে দেবশর্মা।
নাহার চৌধুরী এতক্ষণ স্ক্রিপট ধরে তাকিয়ে ছিলেন জয় সিং ও দেবশর্মার দিকে।
এবার উচ্চকণ্ঠে বললেন-কাট্।
অনন্তবাবু ক্যামেরা থেকে সরে দাঁড়ালেন, বললেন-গুড শট্ হয়েছে।
পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন নাহার চৌধুরী।
এবারের দৃশ্যে থাকবে হিরো মাসুদের ভূমিকার মিঃ চৌধুরীবেশি দস্যু বনহুর। রত্নাদেবীর ভূমিকায় জ্যোছনা রায়। রাজা পরশ রায়ের ভূমিকায় আহম্মদ আলী এবং সেনাপতি জয় সিংয়ের চরিত্রে বিশু সেন। সহনায়িকা নাসিমা বানু থাকবে জ্যোছন রায়ের সঙ্গে। নাসরিনের ভূমিকায় অভিনয় করছে নাসিমা বানু। মাসুদের পিতা মাহমুদের চরিত্রে থাকবেন আসগর হোসেন। অদুরে পাশাপাশি কয়েকটা তাবু পড়েছে।
তাবুর অদুরে একটা খাটিয়ার বসে রাজা পরশ রায় ও জয়সিং। একটা মোড়ার মত বসবার আসনে বসে মাহমুদ। তিনজনের মধ্যে আলাপ হচ্ছে।
ক্যামেরা তাদের ধরে নিয়ে এগুলো।
পরিচালক উচ্চকণ্ঠে বললেন-কাট্।
এবার ক্যামেরা এলো তাবুর মুখে, জ্যোছনা রায় ও নাসিমা বানু বেরিয়ে এলো বাইরে। উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসছে। জয়সিং ইঙ্গিত করলো রাজা পরশ রায়কে।
রাজা পরশ রায় আর জয়সিং তাকিয়ে আছে ওদিকে।
পেছনে এসে দাঁড়ালো মাসুদ -কি দেখছেন?
চমকে একসঙ্গে ফিরে তাকালো রাজা পরশ রায় আর জয়সিং।

জ্যোছনা রায় আর নাসিমা বানুর মুখ থেকে ক্যামেরা এসে পড়লো রাজা পরশ রায় আর রাজা জয় সিংয়ের ওপর।

পরিচালক বললেন–কাট্।

শটের পর শট্ গ্রহণ চললো।

সন্ধ্যা অবধি একটানা সুটিং চলার পর শেষ হলো পরিচালক নাহার চৌধুরীর কাজ।

'কুন্তিবাঈ' ইউনিট ফিরে চলার জন্য সবাই গাড়িতে উঠে বসলো।

এবারও সামনের গাড়িতে ড্রাইভ আসনের পাশে বসলো বনহুর আর জ্যোছনা রায়।

পেছনের আসনে পরিচালক নাহার চৌধুরী, বিশু সেন ও আহম্মদ আলী।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে একটা সুতীক্ষ্নধার ছোরা এসে বিধে গেলো খচ করে জ্যোছনা রায়ের কাঁধের পাশ ঘেষে ড্রাইভারের পিঠে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে ড্রাইভার উবু হয়ে পড়ে গেলো গাড়ির হ্যাণ্ডেলের ওপর।

মুহূর্তে এতবড় একটা অঘটন ঘটে গেলো।

পেছনে আসনের দরজা খুলে ব্যস্তভাবে নেমে পড়লেন নাহার চৌধুরী ও তাঁহার সহকর্মিগণ।

বনহুর ততক্ষণে ছোরাখানা ড্রাইভারের পিঠ থেকে তুলে নিয়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

কোন্ দিক থেকে ছোরাটা এলো— কেন ছোরা মারা হয়েছে, কে মেরেছে-- হই হই পড়ে গেলো গোটা ইউনিটে।

কিন্তু কেউ এর সঠিক জবাব খুঁজে পেলো না।

তবে এটা স্পষ্ট বুঝা গেলো–যেখান থেকেই ছোরাটা এসে থাকুক বা যেই মেরে থাকুক জ্যোছনা রায়কে উদ্দেশ্য করেই ছোরাটা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। ছোরাটা তার দেহে না লেগে গেঁথে গিয়েছে ড্রাইভারের পিঠে।

জ্যোছনা রায়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই যে ছোরাখানা নিক্ষেপ করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যেদিক থেকে ছোরাখানা এসেছিলো সেদিকে অনেক সন্ধান করা হলো কিন্তু কারও খোজ পাওয়া গেলো না।

হঠাৎ এই দুর্ঘটনার জন্য গোটা ইউনিট চিন্তিত এবং ব্যথিত হয়ে পড়লো। নাহার চৌধুরী একেবারে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। এত বড় একটা ঘটনা কম কথা নয়।

সেদিনের পর থেকে জ্যোছনা রায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। জীবনের মায়া কার না আছে। জ্যোছনা রায়ের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছোরা নিক্ষেপকারী অন্য কেউ নয়–অরুণ বাবু।

কথাটা এক সময় বললো জ্যোছনা রায় বনহুরকে–মিঃ চৌধুরী, আপনি যাই বলুন, আমাকে লক্ষ্য করে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো অরুণ বাবু।

হেসে বললো বনহুর–সেই যে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো তার প্রমাণ কি?

সুটিংয়ে যাবার পূর্বে সে আমাকে মৃত্যুভয়ে ভীত করতে চেষ্টা করেছিলো।

বনহুর বললো আবার–সত্যি যদি অরুণ বাবু আপনাকে ভালবেসে থাকে মিস রায়, তাহলে সে আপনাকে যতই মৃত্যুভয় দেখাক আসলে আপনাকে হত্যা করতে পারবে না।

মিঃ চৌধুরী, আপনার কথায় সাহস পাচ্ছি না, কিন্তু একটু থেমে বললো জ্যোছনা রায়–মিঃ চৌধুরী, ভালবাসা কোনোদিন জোর করে আদায় করা যায় না। অরুণ কুমারকে আমি কোনোদিন ভালবাসতে পারবো না।

তার অপরাধ?

অপরাধ তার কিছু নেই। একদিন বলেছি–মনের ওপর কারও হাত নেই।

নিহত ড্রাইভারকে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে আবার 'কুন্তিবাঈ' ইউনিট শহর অভিমুখে রওয়ানা দিলো।

এবার জ্যোছনা রায়কে গাড়ির মাঝখানে বসিয়ে নেয়া হলো। নাহার চৌধুরীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, জ্যোছনা রায় নিহত হলে শুধু চিত্রজগতেরই ক্ষতি হবে না, তিন লাখ টাকা ব্যয়ে 'কুন্তিবাঈ' ছবিটাও সমুলে বিনষ্ট হবে। ছবির তিন ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন এক ভাগ কাজ বাকী।

পথে আর কোনো বিপদ হলো না সত্য, কিন্তু সকলের মুখোভাব মলিন বিষণ্ন, কারও মুখে কোনো কথা নেই।

ব্যাপারটা যখন প্রযোজক আরফান উল্লাহর কানে গেলো তখন তিনি একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। একে তাঁর বহু সোনা মধুগঙ্গার বুকে সমাধিস্থ হয়েছে তারপর তাঁর ছবির নায়িকার ওপর এই অদ্ভুত হামলা আরফান উল্লাহকে একেবারে ভাবিয়ে তুললো।

কে এমন ব্যক্তি তার পিছু লেগেছে যে তার সর্বান্তকরণে অমঙ্গল চায়। তাকে সর্বস্বান্ত করেই সে খুশি নয়, তাঁর ছবিটাকেও সমুলে নষ্ট করতে চায়?

কিন্তু অনেক ভেবেও কোনো সন্দিগ্ধজনের সন্ধান আরফান উল্লাহ পেলেন না।

মিস রায়, এ কথা আমিও জানি। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে গেলো বনহুর।

জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে ড্রইংরুমে কথা হচ্ছিলো বনহুরের।

এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ হয়।

ইয়াসিন এসে জানায়–স্যার, আপামনি আইসেছেন।

বনহুর স্বচ্ছকণ্ঠে বলে–আসতে বলো।

চলে যায় ইয়াসিন।

আতিয়ার আগমনের খবর শুনে জ্যোছনা রায় বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো মুহুর্তে তার মুখমণ্ডলে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠলো।

বনহুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে গেলো, যদিও জ্যোছনা রায় বনহুরের কাছে নিজের উদ্বেগ গোপন করবার চেষ্টা করছিলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলো না বনহুর, কক্ষে প্রবেশ করলো আতিয়া।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে আতিয়াকে সাদর সম্ভাষণ জানালো–হ্যালো মিস আতিয়া।

গুড ইভনিং মিঃ চৌধুরী---আতিয়ার কথা শেষ হয় না, জ্যোছনা রায়ের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠলো।

জ্যোছনা রায় জড়োসড়োভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর একবার জ্যোছনা রায় ও আতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, বললো–বসুন মিস আতিয়া।

আসন গ্রহণ করলো আতিয়া। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে ক্রুদ্ধ ভাব।

জ্যোছনা রায় বললো এবার–চলি মিঃ চৌধুরী।

আতিয়াই জবাব দিলো জ্যোছনা রায়ের কথায়–যাবেন কেন, বসুন।

কথাটা স্বাভাবিক হলেও আতিয়ার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শোনালো। কেমন যেন বেসুরো লাগলো বনহুরের কাছে।

জ্যোছনা রায় বসে পড়লো।

আতিয়া বললো আবার –মিস জ্যোছনা, আপনার কাজ স্টুডিওতে, এখানে নয়। আমি শুনেছি, আপনি নাকি প্রায়ই এখানে আসেন, কিন্তু কেন, জানতে পারি কি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আতিয়া জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে।

জ্যোছনা রায় শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী। আতিয়ার পিতার অর্থের বিনিময়ে কাজ করলেও সে কাউকে ভয় করে না। ভয় করে সে আত্মমর্যাদার হানি হওয়াকে।

আতিয়ার কথায় জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, অধর দংশন করতে লাগলো সে।

বনহুর কোনো কথা না বলে উভয়ের মুখোভাব লক্ষ্য করছিলো।

আতিয়ার প্রশ্নের জবাবে বললো জ্যোছনা রায়–মিস আতিয়া আপনি ভুল করছেন। আপনাদের ছবিতে কাজ করি বলেই স্টুডিওর বাইরে যাওয়া আমার মানা নেই।

বোমার মতই ফেটে পড়ে আতিয়া–এত সাহস আপনার মিস জ্যোছনা। জানেন আমি যা খুশি তাই করতে পারি?

যা খুশি তাই করতে পারলেও আমার জীবনপথে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না–এটাও আমি জানি।

মিস জ্যোছনা, এত বড় কথা আমার মুখের ওপর বলতে সাহস হলো আপনার!

আপনার আপত্তিজনক কথাগুলোই আমাকে বলতে সাহসী ও বাধ্য করেছে।

মিস জ্যোছনা, মনে রাখবেন এটা আমার বাড়ি--

এবার যেন জ্যোছনা রায়ের চেহারা কেমন বিমর্ষ দেখালো। নিজের অলক্ষ্যে দৃষ্টি চলে গেলো বনহুরের মুখের দিকে।

আতিয়া বললো–এর পর আর কোনোদিন যেন এ বাড়িতে আপনাকে না দেখি।

আতিয়ার কথা শেষ হয় না, বনহুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো –মিস আতিয়া, এ বাড়ি এখন আমার! এ বাড়িতে কাউকে আসতে নিষেধ করলে তা আমিই করবো, আপনি নন।

আতিয়া ভীষণ ক্রোধভরে উঠে দাঁড়ালো –মিঃ চৌধুরী, আপনি–আপনি এত বড় কথা--

হাঁ, আমাকে যখন আপনি এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন তখন মিস রায়কেও দিতে পারবেন, তার পূর্বে নয়।

আতিয়ার কুৎসিত মুখমণ্ডল আরও কুৎসিত হয়ে উঠলো। যেন একটা মাটির পাতিলের তলা। একবার বনহুর আর একবার জ্যোছনা রায়ের মুখে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে কক্ষ থেকে।

হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা দমকা হাওয়ায় কক্ষের বাতিগুলো দপ্ করে নিভে গেলো মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বনহুর আর জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনা রায়ই প্রথমে কথা বললো–মিঃ চৌধুরী, আমার জন্য কেন আপনি নিজের অমঙ্গল ডেকে আনলেন।

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর–হাঃ হাঃ হাঃ -- হাঃ হাঃ হাঃ --- হাঃ হাঃ হাঃ--

হাসি যেন থামতে চায় না বনহুরের।

জ্যোছনা রায় হতবাক স্তম্ভিত হয়ে পড়লো, তাকিয়ে রইলো সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত। এমন হাসি সে কোনোদিন শোনেনি।

হাসি থামিয়ে বললো বনহুর–অমঙ্গল! আমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে, এইতো? মিস রায়, আপনি মনে রাখবেন–যতক্ষণ 'কুন্তিবাঈ' ছবি শেষ না হবে ততদিন শুধু আমাকেই নয়, এ বাড়ি থেকে আপনাকেও তাড়াতে সক্ষম হবে না আতিয়া।

আপনি জানেন না মিঃ চৌধুরী আতিয়া কত ভয়ঙ্কর মেয়ে!

ভয়ঙ্কর তার চেহারা, কিন্তু মনটা সত্যি ভয়ঙ্কর নয়।

আজকের ঘটনার পরও আপনি ওর সম্বন্ধে এমন উক্তি করতে পারলেন মিঃ চৌধুরী?

মিস আতিয়ার আসল রূপ আমি দেখেছি মিস রায়, মুখে বললেও সত্যি যে হৃদয়হীনা নয়।

জ্যোছনা রায় গম্ভীর হলো।

বনহুর বললো–চলুন কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক।

মন ভাল নেই, আজ থাক।

মন ভাল নেই বলেই তো যাবো। উঠুন মিস রায়।

জ্যোছনা রায় এবার আর কোনো আপত্তি করতে পারলো না।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে কক্ষের বাইরে বেরুলো।

জ্যোছনা রায় অনুসরণ করলো তাকে।

আরফান উল্লাহ বিশ্রামকক্ষে বসে কি যেন একটা হিসাব নিকাশ করছিলেন। মনের অবস্থা খুব ভাল নয়। এ মাসে তার সবদিকে প্রচুর লোকসান গেছে।

আজও একটা গোপন ব্যবসার হিসেব দেখছিলেন আরফান উল্লাহ।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো আতিয়া। চোখেমুখে তার ক্রুদ্ধভাব ফটে উঠেছে।

কন্যার পদশব্দে চোখ তুলে তাকালেন আরফান উল্লাহ, বললেন –আতিয়া, খবর কি মা?

আব্বা, তুমি আমার সম্মান চাও, না অর্থ চাও?

একি কথা একি কথা বলছো মা?

সত্যি কথা!

কি হয়েছে বলো? বললেন আরফান উল্লাহ।

রাগত কণ্ঠে বললো আতিয়া –মিঃ চৌধুরী আমাকে অপমান করেছেন।

মিঃ চৌধুরী তোমাকে অপমান করেছেন, বলো কি!

হাঁ, কিন্তু আসলে তাঁর কোনো দোষ নেই।

মানে? ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন আরফান উল্লাহ কন্যার মুখের দিকে।

আতিয়া পিতার পাশের সোফায় ধপ করে বসে পড়ে বললো–জ্যোছনা রায়ের কারণেই মিঃ চৌধুরী আমাকে অপমান করলেন।

একটা অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠলো আরফান উল্লাহর মুখে, বললেন–মিস রায়?

হাঁ, আব্বা, আমি আরও লক্ষ্য করেছি–সুটিংয়ের পর প্রায়ই সে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বাইরে যায়, এটা কিন্তু ভারী অন্যায়। আব্বা তুমি বলেছো মিঃ চৌধুরীকে তুমি--ভাবী জামাতা---

হাঁ, তাকেই আমি জামাতা করবো, এটা ঠিক। শুধু জামাতা নয়, মিঃ চৌধুরীকে আমার ছবির কাজের জন্য চিরদিনের জন্য আটকে রাখবো, এও ঠিক--

আর যদি মিস জ্যোছনা রায়--

হেঃ হেঃ হেঃ জ্যোছনা রায়! জ্যোছনা রায় আমার কাজে বাদ সাধবে। লক্ষ জ্যোছনা রায় এলেও আমার কাজে বা আমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারবে না। মিঃ চৌধুরীকে আমি জামাতা করবোই।

কিন্তু আব্বা--

না, রাগ বা অভিমান নয়। মিঃ চৌধুরী যাতে ক্ষুন্ন না হয়, তাই করবে আতিয়া।

আমি সেখান থেকে রাগ করে চলে এসেছি।

তাতে কি আছে, আবার যাবে।

এতে আমার সম্মানে বাধবে না?

স্বার্থের জন্য সম্মানবোধ বিসর্জন দিতে হবে মা! তুমি গিয়ে মিঃ চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

তা আমি পারবো না আব্বা।

পারতে হবে মা, পারতে হবে।

তুমি আমার সঙ্গে যাবে আব্বা?

বেশ, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

সেদিন সুটিং শেষ করে বনহুর আর জ্যোছনা রায় স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঐ দুর্ঘটনার পর জ্যোছনা রায়ের মা বাসন্তী দেবী পরিচালক নাহার চৌধুরীকে ডেকে বলেছিলেন–দেখুন, আমাদের একমাত্র কন্যার কোনো কিছু যেন না হয়।

আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন নাহার চৌধুরী–আপনারা নিশ্চিন্ত থাকবেন, জ্যোছনা রায়ের দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করছি। ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত

আমি নিজে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবো এবং বাড়ি পৌছে দিয়ে যাবো। আমার কোনো অসুবিধা থাকলে প্রযোজক মিঃ আরফান উল্লাহ নিজে পৌছে দেবেন।

কিন্তু জ্যোছনা রায় তার পৌছানোর দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিলো মিঃ চৌধুরীর ওপর। অনুরোধ করে বলেছিলো সে –মিঃ চৌধুরী, আমাদের বাসার পথ হয়েই আপনাকে ফিরতে হয়। আমাকে একটু পৌছে দিয়ে যাবেন রোজ। একথাও বলেছিলো জ্যোছনা রায়–কারও কাজ আগে হয়ে গেলে আমরা উভয়ে উভয়ের জন্য অপেক্ষা করবো, কেমন?

বনহুর হেসে জবাব দিয়েছিলো–আচ্ছা; কিন্তু যেদিন আমার কাজ একেবারেই থাকবে না সেদিন?

জ্যোছনা রায় চিন্তিতভাবে বলেছিলো–সেদিন অগত্যা বেছে নেবো একজনকে। নাহার চৌধুরী কিংবা মিঃ আরফান উল্লাহর গাড়িতে ফিরবো।

এমন সময় নাহার চৌধুরী এসেছিলেন সেখানে। পকেট থেকে কপালের ঘাম মুছে রুমালখানা পকেটে রাখতে রাখতে বলেছিলেন–আমরা দু'জনে অগত্যা, কেমন?

একসঙ্গে চমকে উঠছিলো বনহুর আর জ্যোছনা।

জ্যোছনা রায়ের কথাগুলো তাহলে শুনে ফেলেছেন নাহার চৌধুরী।

জ্যোছনা রায় লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলো যেন।

নাহার চৌধুরী হেসে বললেন–তবু যে আমাদের গাড়িতে যেতে চাইলেন এটাও আমাদের কম সৌভাগ্য নয় মিস রায়।

সে কথাও অবশ্য মিথ্যা নয়। তখন চলচ্চিত্র জগতে নায়িকা হিসেবে জ্যোছনা রায় সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্যোছনা রায়ের বিপরীতে কাজ করার জন্য সবগুলো নায়ক অতি আগ্রহান্বিত!

কিছুদিন আগে একসঙ্গে বেশ কয়েকখানা ছবিতে জ্যোছনা রায়কে কাজ করতে হয়েছে। বিভিন্ন ছবির হিরো ছিলো বিভিন্ন জন। অনেকগুলো নায়কের বিপরীতে নায়িকার চরিত্রে কাজ করেছে সে।

কিন্তু ইদানীং জ্যোছনা রায় 'কুন্তিবাঈ' ছবি ছাড়া কোনো ছবিতে অভিনয় করছে না। তার কারণ, আরফান উল্লাহ্ তাঁর ছবির নায়িকাকে অন্য ছবিতে কাজ করতে দিতে রাজী নন, অবশ্য এজন্য আরফান উল্লাহ জ্যোছনা রায়কে মোটা টাকা দিয়েছিলেন।

'কুন্তিবাঈ' ছবি করাকালীন বহু ছবিতে অভিনয় করতে জ্যোছনা রায়ের ডাক এসেছে, কিন্তু জ্যোছনা রায় নিরুপায়–'কুন্তিবাঈ' ছবি শেষ না হলে কোনো ছবিতে সে কাজ করতে পারবে না।

বহু ছবির হিরো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছে। অনেকে প্রকাশ্যে বলেছে জ্যোছনা রায় ছাড়া তার নাকি মুড আসে না।

জ্যোছনা রায়ের প্রতীক্ষায় অনেক প্রযোজক দিন গুণছেন, 'কুন্তিবাঈ' শেষ না হলে ছবির কাজ শুরু করবেন না।

জ্যোছনা রায়কে পেয়ে কে না ধন্য হবে বলুন? এবারও বললেন নাহার চৌধুরী।

হাসলো বনহুর।

কিন্তু জ্যোছনা রায় মিঃ চৌধুরী ছাড়া কারও গাড়িতেই ফিরতে চায় না। এটা যেন তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বনহুর কোনো আপত্তি করতে পারে না।

সেদিন স্টুডিও থেকে বেরিয়ে বনহুর আর জ্যোছনা রায় পাশাপাশি গাড়ির দিকে এগুচ্ছিলো।

উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলো।

পেছন থেকে ডাকলেন নাহার চৌধুরী–মিস রায়!

থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে তাকালো জ্যোছনা রায় এবং বনহুর।

নাহার চৌধুরী এগিয়ে এলেন–আংগুলের ফাঁকে ধুমায়িত অর্ধ দগ্ধ সিগারেট।

জ্যোছনা রায় এবং বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন নাহার চৌধুরী –আপনাদের কাজ তো হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। বললো জ্যোছনা রায়।

নাহার চৌধুরী হস্তস্থিত অর্ধদগ্ধ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরাটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললেন। তারপর বললেন–মিস রায়, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

জ্যোছনা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

নাহার চৌধুরী হেসে বললেন–আজ না হয় আমার সঙ্গেই যাবেন।

বনহুর বললো –মিস রায়, তাই যাবেন। তাছাড়া আজ একটু আমাকে অন্য পথে ফিরতে হচ্ছে।

জ্যোছনা রায়, কোনো কথা বললো না।

বনহুর জ্যোছনা রায় ও নাহার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বললো– গুডবাই।

জ্যোছনা রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললো –গুডবাই।

নাহার চৌধুরী বললেন–আসুন মিস রায়।

জ্যোছনা রায় নাহার চৌধুরীকে অনুসরণ করলো।

স্টুডিওর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলেন নাহার চৌধুরী।

পেছনে জ্যোছনা রায়।

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে চমকে উঠলো জ্যোছনা রায়, কক্ষে একটা সোফায় বসে আছে আতিয়া, দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন।

জ্যোছনা রায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকালো সে নাহার চৌধুরীর মুখের দিকে।

কথা বললেন নাহার চৌধুরী প্রথমে–মিস রায়, আপনি জানেন 'কুন্তিবাঈ' ছবির নায়িকার চরিত্রে কাজ করছেন আপনি, আর নায়কের চরিত্রে কাজ করছেন মিঃ চৌধুরী।

বলুন! রাগতকণ্ঠে বললো জ্যোছনা রায়।

নাহার চৌধুরী এবার ভূমিকা ত্যাগ করে বললেন–ছবির নায়ক এবং নায়িকা সম্পর্ক আপনার আর মিঃ চৌধুরীর মধ্যে। বলুন সত্য কি না?

হাঁ।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে ছবির কাজ ছাড়া আপনার মেলামেশা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। আমরা চাই না আপনি তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন বা মেশেন।

জ্যোছনা রায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো–আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কারও কথা শুনতে রাজী নই। জ্যোছনা রায় কথাটা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

নাহার চৌধুরী তাকালেন আতিয়ার মুখের দিকে।

আতিয়া ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করছে।

হেসে বললেন নাহার চৌধুরী–দেখুন মিস আতিয়া, ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিস জ্যোছনা রায়কে কঠিনভাবে কিছু না বলাই ভাল। তা ছাড়া আজ তাকে কথাটা অমনভাবে বলা উচিত হয়নি, যদিও আমিই বলেছি--

কি উচিত কি অনুচিত আমি জানি মিঃ নাহার। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো আতিয়া।

নাহার চৌধুরী হাসলেন আপন মনে।

বাসায় ফিরে জ্যোছনা রায় নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র কন্যাই তাঁদের সম্বল, আশা–ভরসা সব। সংসারে এমন অভাব নেই যার জন্য জ্যোছনা রায়কে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে হচ্ছে। অভিনয় জ্যোছনার পেশা নয়–নেশা।

যদিও পিতামাতার ইচ্ছা ছিলো না তবু কন্যার জিদেই বাধ্য হয়ে তাঁরা কন্যাকে মত দিয়েছিলেন অভিনয়ে।

জ্যোছনা অল্পদিনেই শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

কন্যার কৃতিত্বে জননীর মন ভরে উঠেছে। একটা উজ্জ্বল আশার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তাঁকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। তিনি সব সময় ওর মঙ্গল কামনা করেন।

কন্যাকে স্টুডিও থেকে বিষন্ন মুখে ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়তে দেখে মায়ের প্রাণ আশঙ্কিত হলো, ব্যাকুলভাবে ছুটে এলেন তিনি কন্যার পাশে। পিঠে হাত রেখে ডাকলেন–জ্যোছনা, মা–কি হয়েছে তোর?

মায়ের স্নেহভরা কথায় জ্যোছনার মন আরও আকুলভাবে কেঁদে উঠলো। অনেকক্ষণ মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদলো জ্যোছনা রায়।

মা নীরব রইলেন কিছুক্ষণ, ভাবলেন কেঁদে মেয়ে কিছুটা শান্ত হয়েনিক। এবার জিজ্ঞাসা করলেন–মা, কি হয়েছে তোর?

জ্যোছনা রায় মুখ তুলে তাকালো মায়ের দিকে–মা, তুমি জানো আমি মিঃ চৌধুরীকে ভালবাসি। তিনি সত্যিই একজন মহৎ ব্যক্তি--

মায়ের কোলে মাথা রেখে যখন জ্যোছনা রায় কথাগুলো বলছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালো। তার কানে ভেসে এলো জ্যোছনা রায়ের কথাগুলো। বনহুর স্টুডিওতে লক্ষ্য করেছিলো— জ্যোছনা রায়কে পরিচালক নাহার চৌধুরী ডেকে নিয়ে যাবার সময় তাঁর মুখোভাব খুব প্রসন্ন ছিলো না, হঠাৎ জ্যোছনাকে এভাবে ডেকে নিয়ে যাবার কারণ কি থাকতে পারে--- বনহুরকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলো ব্যাপারটা। তাই সে জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে এসেছে দেখা করতে– কেন তাকে নাহার চৌধুরী ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা জানতে। যদিও এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তবুও বনহুরের মনে হঠাৎ আজ কেন যেন একটা আশঙ্কা বারবার উঁকি দিচ্ছিলো বাসায় ফিরে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলো না বনহুর। কাজেই চলে এসেছে জ্যোছনার নিকট সব জানতে।

বনহুর পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলো জ্যোছনা রায়ের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর–মা, আমি তাকে ভালোবেসে কোনো ভুল করিনি। তাঁর বাইরের সৌন্দর্যের চেয়েও ভেতরটা আরও সুন্দর যার তুলনা হয় না। এতটুকু কুৎসিত ইংগিত নেই তাঁর মধ্যে --মা, আমি জানি না কেন ওরা আমাকে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না? কেন তারা আমাকে সন্দেহ করে--- আজ আমাকে তাঁর সঙ্গে এক গাড়িতে আসতে দিলো না, ডেকে নিয়ে গেলেন পরিচালক, কথা আছে নাকি আমার সঙ্গে। জানো মা, গিয়ে কি দেখলাম?

বিছানায় সোজা হয়ে বসলো জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনার মা ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন–কি মা, কি দেখলি?

মা, সে অতি বিস্ময়কর দৃশ্য। নাহার চৌধুরীর সঙ্গে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলাম। মিস আতিয়া বসে আছে, দু'চোখে যেন তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

প্রযোজক আরফান উল্লাহর মেয়ে আতিয়া?

হাঁ মা।

কেন রে, কেন সে অমনভাবে সেখানে বসেছিলো?

সে কথাই তোমাকে বলছি মা, শোনো। মিস আতিয়া আমাকে দেখে অধর দংশন করতে লাগলো। আমাকে সে যে সহ্য করতে পারে না, এটা আমি জানতাম। কি করেছি, কেন আমাকে ডেকে আনা হলো সে কথাই আমি ভাবছিলাম। আমি মিস আতিয়ার মুখে তাকাতেই সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। বললেন নাহার চৌধুরী–মিস জ্যোছনা রায়,আপনাকে কেন ডেকেছি শুনুন– মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছবির সুটিং মুহূর্তে–তারপর নয়। ছবির কাজের বাইরে আপনাদের মেলামেশা সন্তোষজনক নয়। আমরা চাই না আপনি তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন বা মেশেন --মা, বলো কি এমন অপরাধ করেছি যে, তাঁর সঙ্গে মিশতে পারবো না।

জ্যোছনা, আমি আগেই বলেছিলাম ওসব ভালো নয়, আজ বুঝতে পারছিস তো?

মা, আমি আর অভিনয় করবো না।

পাগলী মেয়ে, তা কি হয়।

কেন হবে না- সত্যি আমি আর অভিনয় করবো না।

এমন সময় পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর।

জ্যোছনার মা বলে ওঠেন –বাবা তুমি এসেছো?

আজকাল জ্যোছনার সঙ্গে প্রায়ই বনহুরকে এ বাড়িতে আসতে হতো, জ্যোছনার তা তাই তাকে তুমি বলেই সম্বোধন করতেন।

বনহুর একটা আসনে বসে পড়ে বললো–মিস রায় কখন এসেছেন?

এই তো কিছুক্ষণ হলো।

আমি জানতে এলাম উনি পৌছেছেন কিনা! চলি তাহলে?

না না, একটু বসো বাবা। বললেন জ্যোছনার মা। একটু থেমে পুনরায় বললেন–জানো, জ্যোছনা আর ছবিতে কাজ করতে রাজী নয়।

হাসলো বনহুর–মুখে রাজী নয় বলা সহজ, আসলে অতো সহজ নয়, কারণ উনি চুক্তিবদ্ধ –বিশেষ করে 'কুন্তিবাঈ' ছবি ওঁকে শেষ করতেই হবে, তারপর ইচ্ছা করলে অভিনয় থেকে সরে আসতে পারেন।

তাই ভালো হবে। তাই ভালো হবে বাবা।

এবার বললো জ্যোছনা রায়–কিন্তু তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করতে রাজী নই আমি।

শান্তকণ্ঠে বললো বনহুর–এই তো সামান্য আর কিছুদিন। 'কুন্তিবাঈ' ছবির সুটিং শেষ হতে আর মাসখানেক লাগতে পারে--

হাঁ, এরপর আমি আর কোনো ছবিতে কাজ করবো না।

বেশ, তাই হবে। জ্যোছনা রায়ের কথায় বললো বনহুর।

জ্যোছনার মা উঠে দাঁড়ালেন–বসো বাবা, তোমাদের জন্য একটু জলখাবার নিয়ে আসি।

না থাক। বললো বনহুর।

কিন্তু ততক্ষণ বেরিয়ে গেছেন জ্যোছনার মা।

জ্যোছনা রায় তাকিয়ে ছিলো বনহুরের দিকে। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বললো সে–মিঃ চৌধুরী, জানেন আমাকে আজ পরিচালক কেন তখন ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন? ছবির কাজের বাইরে আপনার সঙ্গে--

মিস রায়, আমি সব শুনেছি; আপনি যখন মায়ের কাছে বলছিলেন তখন দরজার বাইরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

মিঃ চৌধুরী!

হাঁ মিস রায়, আপানি নার্ভাস হবেন না।

কিন্তু--থামলো জ্যোছনা।

বলুন?

কিন্তু আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কারও কথা শুনতে রাজী নই। ছবির কাজের বাইরে আমার ইচ্ছামত যা খুশি তাই করবো বা করতে পারি।

আচ্ছা, আমি পরিচালক নাহার চৌধুরীকে বলবো আপনার কথাটা।

তাঁকে নয়, আরফান উল্লাহকে বলবেন দয়া করে। একটু থেমে বললো জ্যোছনা রায় –জানি না, আতিয়া কেন আমাকে বারবার এমনভাবে অপমান করছে।

'কুন্তিবাঈ' ছবির পর সব শেষ হয়ে যাবে মিস রায়। কারণ, আতিয়ার যত আক্রোশ আমার ওপর।

আপনার ওপর!

হাঁ, আমার ওপর, আর তারই জের চলছে আপনার ওপর– বুঝলেন?

জ্যোছনা রায় সরে এলো বনহুরের পাশে– মিঃ চৌধুরী, আমার মনে হয় মিস আতিয়া আপনাকে---

ভালবাসে এই তো বলতে চাইছেন?

হাঁ মিঃ চৌধুরী, নাহলে সে কিছুতেই আপনার পাশে আমাকে সহ্য করতে পারছে না কেন?

আপনি ঠিকই বলেছেন মিস রায়।

তবে কি--তবে কি আপনি--আপনি--

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনা রায় দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরলো। তারপর স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডলে।

বনহুরও তাকিয়ে আছে।

জ্যোছনা রায়ের শরীর যেন টলছে–পড়ে যাবে এই মুহূর্তে।

বনহুর এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেললো।

জ্যোছনা রায় বনহুরের কাঁধে মাথা রাখলো, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

বনহুর পুনরায় বললো–মিস রায়? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

হাঁ, আমাকে শুইয়ে দিন।

বনহুর জ্যোছনা রায়কে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বললো–মিস রায়, আপনি ঘুমান, আমি চললাম।

জ্যোছনা কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর লঘু পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করলো।

পরমুহূর্ত কক্ষে প্রবেশ করলেন জ্যোছনার মা, হাতে তাঁর জল খাবারের ট্রে। অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন–সে কই জ্যোছনা?

চলে গেছে।

চলে গেছে! বলিস কি, আমি জলখাবার আনতে গেলাম।

কেন গেলো মা? তুমি জানো না--মিঃ চৌধুরীর মনও পাল্টে গেছে। আমি বড় হতভাগি--দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনার মা হতবাক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কন্যার বুকের ব্যথা মায়ের অন্তরেও আঘাত করলো।

❑

বনহুরের অন্তর্ধানের পর আস্তানায় একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে সত্য, কিন্তু তাই বলে এতগুলো অনুচর একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

সর্দারের অনুপস্থিতিতে রহমান তার অনুচরগণকে পরিচালনা করছে বটে কিন্তু বনহুরের অভাব তারা সব সময় অনুভব করছে। বিশেষ করে অশ্ব তাজ

একেবারে জীর্ণশির্ণ হয়ে পড়েছে। বনহুর নিজে ওকে ছোলা, ঘাস খাওয়াতো, গা নেড়ে আদর করতো। তাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয় দস্যু বনহুরের।

আজ কতদিন মনিবের স্পর্শ পায়নি তাজ, সে একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে।

রহমানের মনের অবস্থাও তাই; কতকটা তাজের মতোই। কিন্তু তাজ পশু আর রহমান মানুষ। মনকে শক্ত করে নিয়েছে রহমান, ভেঙ্গে পড়লে তার চলবে না। সর্দারের এত পরিশ্রমে গড়া আস্তানা নষ্ট হতে দেবে না সে।

রহমান শুধু আস্তানাই ঠিক রাখেনি, মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে সর্দার গৃহিণীর সন্ধানও জেনে আসে।

একদিন মনিরা দোতলার রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ তার নজর চলে গেলো সামনের বাগানে। বাগানে খেলা করছিলো নূর। অদূরে একটা পাথরাসনে বসে নূরকে খেলা দিচ্ছিলেন বৃদ্ধা সরকার সাহেব।

একটা বল নিয়ে ছুটাছুটি করছিলো নূর।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব হাসছিলেন।

হঠাৎ মনিরা লক্ষ্য করলো–বাগানের মধ্যে হাস্নাহেনা ঝোপের আড়ালে গালপাট্টা বাঁধা একটা লোক উঁকিঝুকিঁ মারছে। লোকটার বলিষ্ঠ চেহারা, দীর্ঘ দেহ।

সন্দেহ হলো মনিরার।

কে এই লোক, কি এর উদ্দেশ্য, কেনই বা অমনভাবে উঁকিঝুঁকি মারছে? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ নয় কিন্তু কি উদ্দেশ্য ওর? নূরকে চুরি করতে এসেছে নিশ্চয়ই--মনিরা দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে বন্দুকটা বের করে গুলি ভরে নিলো। তারপর ফিরে এসে দাঁড়ালো পূর্বের সেই স্থানে যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নূর এবং সরকার সাহেবকে।

কিন্তু সরকার সাহেব কই, একটু পূর্বেই সরকার সাহেবকে যে স্থানে বসে থাকতে দেখেছিলো মনিরা সেখানে তিনি নেই।

অবশ্য সরকার সাহেব ঠিক সেই দণ্ডে কোনো একটা কাজে বাগানের গেটে গিয়েছেন, এক্ষুণি ফিরে আসবেন তিনি।

মনিরা চমকে উঠলো, নূর কোথায়, কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো, গালপাট্টা বাঁধা লোকটা নূরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নূরকে আদর করছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনিরা বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এক সেকেণ্ড-- তাহলেই লোকটার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হবে মনিরার বন্দুকের গুলী, কিন্তু ছুড়তে পারছে না–কারণ লোকটার কোলে তখন নূর।

মনিরার নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। লোকটা নিশ্চয়ই নূরকে চুরি করতে এসেছে। কিন্তু আজ মনিরা কিছুতেই শয়তানটাকে ক্ষমা করবে না।

লোকটা নূরকে তখনও আদর করছে। মাঝে মাঝে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

মনিরা অধর দংশন করছে। শয়তানটা তার নূরকে নিয়ে পালাবে এবার মনে হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! লোকটা নূরকে আদর করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবার লোকটা চলে গেলো ঝোপটার আড়ালে। বারকয়েক লুকিয়ে ঝুঁকে দেখলো নূরকে, তারপর চলে গেলো সেখান থেকে বাগানের বেড়া টপকে ওপারে।

মনিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বন্দুকসহ হাতখানা নামিয়ে নিলো নীচে।

সরকার সাহেব ততক্ষণে এসে পড়েছেন নূরের পাশে। মনিরা ফিরে এলো নিজের কক্ষে, ভাবতে লাগলো –কে এই লোকটা? কি উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছিলো? নূরকে অমন করে আদর করলোই বা কেন?

মনিরা ভাবছে, কিন্তু ভেবে ভেবে কোনো জবাব খুঁজে পেলো না।

এমন সময় নূর বল হাতে ছুটে এলো মনিরার পাশে। সরকার সাহেব পেছনে পেছনে এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

মনিরা তখনও সেই চিন্তা করছিলো। নূর আর সরকার সাহেবকে দেখে বললো সে–আপনারা এসেছেন!

সরকার সাহেব বললেন–নূরের খেলা শেষ হয়েছে মা মণি!

নূর জড়িয়ে ধরলো মনিরাকে –আম্মা, জানো একটা লোক আমাকে আদর করলো--

মনিরা বললো এবার সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে–সরকার চাচা, আপনি নূরকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

কেন মা?

আপনি যখন বাগান থেকে সরে গিয়েছিলেন তখন একটা গাল–পাট্টা বাঁধা লোক নূরকে কোলে নিয়ে আদর করছিলো--

তারপর? তারপর মা?

তারপর আমি তো মনে করলাম নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট লোক নূরকে চুরি করতে এসেছে। কারণ, আমি রেলিংয়ের ধারে তখন দাঁড়িয়েছিলাম। লোকটার সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে আমি ছুটে এসে বন্দুকটা বের

করে গিয়ে দাঁড়ালাম, যদি নূরকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে শেষ করে দেব। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা নূরকে আদর করে পুনরায় নামিয়ে দিলো কোল থেকে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম।

সরকার সাহেব অবাক হয়ে শুনলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন- কই, আমি তো কিছু জানিনা মা?

আপনি তখন সরে গিয়েছিলেন ওপাশে।

ওঃ আমাকে একজন লোক ডেকে জিজ্ঞেস করছিলো-এটাই কি চৌধুরীবাড়ি? আমি তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম-কিন্তু তা তো সামান্য কয়েক মিনিট?

হাঁ সরকার চাচা, ঐ সময়ের মধ্যেই গালপাট্টা বাঁধা লোকটা এসেছিলো সেখানে।

সত্যি আমি আশ্চর্য হচ্ছি। নিশ্চয়ই সে কোনো কু'মতলব নিয়ে এসেছিলো। কথগুলো বললেন সরকার সাহেব।

মনিরা বললো-সরকার চাচা, আমার মনে হয় সে যেই হোক, কোনো খারাপ মতলব নিয়ে আসেনি। কারণ, সে প্রচুর সময় পেয়েছিলো, নূরকে নিয়ে পালাতে পারতো। অবশ্য পালাবার পূর্বেই আমি তাকে যমালয়ে পাঠাতাম।

মনিরা নূরকে বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো ওর গাল দুটো।

নূর কচি দু'টি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মার গলা।

সরকার সাহেব হাসতে লাগলেন।

এমন সময় মরিয়ম বেগম এলেন কক্ষে। যদিও তিনি পুত্রশোকে মুহ্যমান তবু মনিরা ও নূরকে পেয়ে তাঁর বুকে একটা অনাবিল আনন্দ ও শান্তিধারা বয়ে যায়। মরিয়ম বেগম খুশিভরা কণ্ঠে বললেন-মা-ছেলে খুব যে আনন্দ করা হচ্ছে!

এখানে নূরকে নিয়ে সরকার সাহেব, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা যখন আনন্দে আত্মহারা, তখন কান্দাই বনের পথে দু'জন অশ্বারোহী পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে।

অশ্বারোহীদ্বয় একজন রহমান, দ্বিতীয়জন কায়েস।

কিছুক্ষণ পূর্বে চৌধুরীবাড়ির বাগানে গালপাট্টা বাঁধা যে ব্যক্তি নূরকে আদর করছিলো সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয়-বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান।

মাঝে মাঝে রহমান গোপনে মনিরার সন্ধান নিতে আসতো।

আজও কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো সে মনিরার সন্ধান নিতে।

একটা চাকরের নিকট মনিরার সুসংবাদ গ্রহণ করে যখন ফিরছিল রহমান তখন হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গিয়েছিলো বাগানে খেলায়রত নূরের ওপর। কেমন যেন চমকে উঠেছিলো রহমান–এ যে তার সর্দারের হুবহু প্রতিচ্ছবি–সেই চোখ, সেই মুখ; সেই নাক– অবিকল দেখতে তারই মত। বিস্ময় জেগেছিলো রহমানের মনে, নিশ্চয়ই এটা তাদের সর্দারের সন্তান।

কায়েসকে ডেকে দেখিয়ে বলেছিলো রহমান–কায়েস, দেখতে পাচ্ছো?

কি?

ঐ দেখো বাগানের দিকে তাকিয়ে।

কায়েস তাকিয়ে থ' বনে গেলো হঠাৎ আনন্দধ্বনি করতে যাচ্ছিলো কায়েস, রহমান ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে বললো–চুপ।

কায়েস সামলে নিলো নিজেকে। তাই তো, এ যে একেবারে রাজপুত্র। আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বললো কায়েস–এ যে আমাদের সর্দারের ছেলের মত মনে হচ্ছে।

রহমান বললো–মনে হচ্ছে নয়, নিশ্চয়ই তাঁর সন্তান।

কিন্তু তা কেমন করে হয়। একটু ভেবে বললো কায়েস।

রহমান গম্ভীর গলায় বললো–আমি বললাম এই শিশু আমাদের সর্দারের সন্তান না হয়েই পারে না।

রহমান আর বিলম্ব না করে বাগানের বেড়া টপকে প্রবেশ করে ছিলো ভেতরে। তারপর শিশুটাকে আদর করবার সুযোগ করে নিয়েছিলো সাবধানে।

রহমান বললো এবার কায়েসকে –কায়েস, আমি শপথ করে বলছি, এটাই সেই ছেলে–যাকে নূরী একদিন সন্তানের মত মানুষ করেছিলো---

কেমন করে বুঝলে রহমান?

যদিও বেশ বড় হয়েছে, কিন্তু চিনতে আমার ভুল হয়নি। কিন্তু আর একটা কথা, আমি খোকাকে নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কায়েস আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো–তারপর?

খোকা বললো, আমার নাম নূর। কিন্তু নূরীর শিশুটার নাম ছিল মনি।

কায়েস চমকে উঠলো—কি বললে রহমান, খোকা তার নাম বললো নূর?

হাঁ, ঐ নাম সে বলেছে।

কায়েসের মুখে হাসি ফুটে উঠলো–বললো নূর –সে নূর– ঠিক ধরেছো রহমান, এটাই আমাদের সর্দারের সন্তান নূর–বৌরাণীর ছেলে।

মনিরা ও নূরের কাহিনী সব বললো কায়েস রহমানের কাছে।

তারপর থেকেই রহমান প্রায়ই যেতে শুরু করলো শহরে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে আসতো নূরকে। কোনোদিন ফলমূল, কোনোদিন সোনার আংটি, কোনোদিন সোনার মালা পরিয়ে দিয়ে আসতো তার গলায়।

মনিরার বিস্ময় চরমে উঠলো, কে এই লোক–যে তার সন্তানকে এভাবে এসব দিতে শুরু করেছে। মনে মনে ভাবলো মনিরা নিশ্চয়ই কোনো অভিসন্ধি নিয়ে এসব দিচ্ছে লোকটা।

একদিন মনিরা সরকার সাহেব বা নকীবের সঙ্গে নূরকে বাইরে না পাঠিয়ে সে নিজে এলো বাগানে নূরের সঙ্গে। নূরকে খেলতে দিয়ে চুপ করে সরে গেলো মনিরা আড়ালে।

নূর বল নিয়ে খেলা করছে আপন মনে। কিন্তু লোকটা এলো না।

একদিন দু'দিন তিনদিন কেটে গেলো—লোকটার সাক্ষাৎ নেই। মনিরা অনেক সুযোগ দিয়েছে, নূরকে একা রেখে সরে থেকেছে আড়ালে।

সেদিনও মনিরা এলো নূরকে নিয়ে বাগানে। প্রতিদিনের মত আজও মনিরা নূরকে খেলায় মাতিয়ে দিয়ে সরে পড়লো। একটা পাইন ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলো।

প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেলো, মনিরা ভাউলো –লোকটা আজও আসবেনা। পাইন ঝাড়ের আড়াল থেকে যেমনি বের হতে যাবে, অমনি একটা খস খস শব্দ কানে এলো মনিরার। সচকিতভাবে সরে দাঁড়ালো মনিরা, পাইন ঝাড়ের আড়ালে তাকিয়ে দেখলো–হাঁ, সেই লোকটা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। এদিক –ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা।

অদূরে নূর বল নিয়ে ছুটাছুটি করছে।

মনিরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, আজ সে হাতে নাতে ধরে ফেলবে। কে ঐ লোকটা যে দিনের পর দিন তার নূরকে এভাবে আকর্ষিত করছে?

লোকটা নূরের পাশে গিয়ে আস্তে শিস দিলো।

নূর অমনি ফিরে তাকালো তার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বল ছেড়ে ছুটে এলো লোকটার পাশে।

লোকটা দু'হাত প্রসারিত করে ওকে তুলে নিলো কোলে।

মনিরা শুনতে পেলো নূরের কণ্ঠস্বর–সিপাহী, আজ আমার জন্য কি এনেছো?

মনিরা স্তব্ধ হয়ে শুনছে ওর কথাবার্তা।

ফিস ফিস করে বললো লোকটা–কি নেবে তুমি বলো?

নূরের কণ্ঠ –আমি --আর কিছু নেবো না।

কেন?

আম্মা বকবেন।

এই দেখো কি এনেছি তোমার জন্য--

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা বেরিয়ে এলো পাইন ঝাড়ের আড়াল থেকে। নূর এবং লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বললো সে–কে তুমি? শয়তান কোথাকার---

রহমান নূরকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মনিরা নূরকে টেনে নিলো নিজের কাছে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো সে, ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে কায়েস –বৌরাণী, বৌরাণী--- ও শয়তান নয়, রহমান---

মনিরা চমকে উঠলো, কোথায় যেন এই স্বর সে শুনেছে? কোথায় যেন দেখেছে ওকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মনিরা কায়েসের দিকে।

কায়েস বললো–বৌরাণী, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি–আমিই সে কায়েস--

মনিরা অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো–কায়েস।

হাঁ, আমি কায়েস আর আপনার সামনে যে দণ্ডায়মান সে সর্দারের প্রধান অনুচর রহমান। কিন্তু বৌরাণী, এই শিশু কে? বলুন–বৌরাণী, এই কি আপনার সেই নূর?

কায়েস, সত্যিই ধরেছো, এটাই আমার সেই হারানো ধন নূর। মনিরা রহমানের দিকে তাকালো–আমাকে মাফ করো রহমান, আমি তোমাকে চিনতে না পেরে--

রহমান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–বৌরাণী!

নূর এবার বুঝতে পারলো–তার আম্মা লোকটার ওপর প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে বেশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। নূর একবার আম্মা আর একবার রহমানের মুখে তাকাচ্ছে।

রহমান নূরকে টেনে নিলো আবার কোলের কাছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–বৌরাণী, আমরা সর্দারকে হারিয়ে একেবারে মূহ্যমান হয়ে পড়েছি। জানিনা তিনি জীবিত না মৃত--

মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

কায়েস আর রহমানের চোখও অশ্রু ছল ছল করছে।

মনিরা বললো এবার–জানি, তোমরাও আমারই মত ব্যথিত দুঃখিত তোমাদের সর্দারের জন্য। কিন্তু মনে রেখো রহমান, তোমাদের সর্দার মৃত নয় জীবিত আছে–আমার মন বলছে সে জীবিত আছে।

রহমান আর কায়েসের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠলো, বললো রহমান–বৌরাণী, আপনার কথা যেন সত্য হয়।

আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি বৌরাণী? বললো কায়েস।

মনিরা আঁচলে চোখের পানি মুছে বললো–বসবে না?

রহমান বললো আমরা আবার আসবো--নূরকে আদর করে বললো–সর্দারের অভাব আমরা ওকে দিয়েই পূরণ করবো বৌরাণী। আচ্ছা, আজ যাই আমরা?

এসো। বললো মনিরা।

রহমান আর কায়েস অদৃশ্য হলো বাগানের ওপাশে।

মনিরা নূরকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলো ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

❑

সেদিনের পরে জ্যোছনা রায় বনহুরের গাড়িতে একটা দিনও বাড়ি ফেরেনি বা ইচ্ছা করে কোনো সময় তার সঙ্গে কথা বলেনি। বনহুর বুঝতে পেরেছে–জ্যোছনা রায় সেদিন তার ঐ কথার পর ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। তার অন্তরে যে একটা ব্যথার জ্বালা তাকে অহরহ দগ্ধীভূত করছে, জ্যোছনা রায়ের মুখোভাবে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বনহুর যতদুর সম্ভব জ্যোছনা রায়কে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো। সুটিং ছাড়া জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে সে তেমন কোনো কথা বলতো না। বরং আতিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দিলো।

এখন আতিয়া সুটিংয়ের পর নিজে বনহুরকে নিয়ে যায় প্রতিদিন। পৌঁছে দেয় তার বাসায়।

জ্যোছনা রায় চেয়ে দেখে, কোনো কিছু বলে না।

সুটিংয়ের অবসরেও আতিয়া জ্যোছনা রায়কে দেখিয়ে দেখিয়ে বনহুরের হাত ধরে স্টুডিওর বাগানে গিয়ে বসে, –হাসে, গল্প করে, কখনও বা বাগান থেকে গোলাপ ছিঁড়ে গুঁজে দেয় তার কোটের কলারের ফাঁকে।

জ্যোছনা রায় স্টুডিওর রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে। একটা ক্ষুব্ধ ভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মনে। সরে যায় তখন সে রেলিংয়ের পাশ থেকে।

হয়তো গিয়ে দাঁড়ায় ওদিকের নির্জন রেলিংটার ধারে। আজ কাল জ্যোছনা রায়ের কাছে নির্জনতাই যেন বেশি প্রিয়। ছবিতে কাজ না করলে নয় তাই সে আসে স্টুডিওতে। যতক্ষণ ছবির প্রয়োজন ততক্ষণই স্টুডিওতে থাকে। সুটিং শেষ হলেই আস্তে স্টুডিওর সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নীচে। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বলে –চলো।

প্রযোজক কিংবা পরিচালক কারও গাড়িতেই সে যায় না, তাঁদের নিতান্ত অনুরোধেও জ্যোছনা রায় রাজী হয়নি তাঁদের গাড়িতে যেতে।

ইতিমধ্যে জ্যোছনা রায় ষ্টুডিওর বিশ্রামকক্ষে বসে আর এক দিন অরুণ কুমারের একখানা চিঠি পেয়েছিলো। চিঠিটা এইরূপ ঃ

জ্যোছনা,

তোমার অভাবে আজ আমি অন্ধকার দেখছি। এতটুকু দয়া–মায়া তুমি করলে না। কিন্তু মনে রেখো–হয় তুমি আমার হবে, নয় যমের ঘরে যাবে। হত্যা তোমাকে আমি করবোই। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

অরুণ

এ চিঠি পাবার পরও জ্যোছনা রায় এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি বা বিচলিত হয়নি।

পরিচালক নাহার চৌধুরী চিঠিখানা পুলিশে ডায়রী করে দিয়েছেন, তাঁদের ছবির নায়িকার জীবন হানি যাতে না হয় তার জন্য নাহার চৌধুরী এবং আরফান উল্লাহ পুলিশের সাহায্য কামনা করে অনুরোধ জানিয়েছেন।

হঠাৎ যদি কোনো একটা অঘটন ঘটে বসে তাহলে সম্পূর্ণ ছবি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন আরফান উল্লাহ—এবং এ কারণেই তিনি নিজে জ্যোছনা রায়কে সাবধানে চলাফেরার জন্য বারবার বলে দিয়েছেন।

কিন্তু জ্যোছনা রায় কারও কথা কানে নেয় না, নিজের প্রতি আজকাল সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে।

আজ সুটিং শেষে জ্যোছনা রায় যখন রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন তার দেহ মন শিথিল হয়ে এসেছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নির্জন রেলিংটার ধারে এসে দাঁড়ালো সে।

একটু পূর্বে জ্যোছনা রায়ের সামনে দিয়ে আতিয়া মিঃ চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেলো বাগানের দিকে। কি যেন কথা নিয়ে হাসছিলো আতিয়া।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জ্যোছনা রায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলো অন্যদিকে।

আতিয়ার চিকন হাসির সুর এখনও কানে লেগে আছে জ্যোছনা রায়ের। রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকিয়েছিলো সে সামনের ধূসর আকাশের দিকে। মনের আকাশেও তার কালো মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে। কত প্রশ্নই না আজ উঁকি দিয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়ের কোণে। বিশ্বাস হয় না জ্যোছনা রায়ের, মিঃ চৌধুরী তাকে এতদিন ছলনা করে এসেছেন। মিথ্যা অভিনয় তিনি করেছেন, তার সঙ্গে...না না, বিশ্বাস হয় না তার এ কথা— এতদিনের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার সাথে। আজ সব তার মানসপটে স্পষ্ট ভেসে উঠছে।

কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে খেয়াল নেই জ্যোছনা রায়ের।

সে স্টুডিওর বিপরীত দিকে নির্জন রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলো। অন্য সবাই চলে গেছে, মিঃ আরফান উল্লাহ এবং নাহার চৌধুরী জ্যোছনা রায়ের খোঁজ করেছিলেন কিন্তু তাঁরাও জ্যোছনা রায় চলে গেছে মনে করে স্টুডিও ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু বনহুর লক্ষ্য করেছিলো, জ্যোছনা রায় আজ স্টুডিও থেকে যায়নি। সে বাগানে আতিয়ার পাশে বসে থাকলেও দৃষ্টি ছিলো স্টুডিওর পথে। কে যায় বা আসে সেদিকে খেয়াল ছিলো তার।

জ্যোছনা রায় স্টুডিও থেকে বেরিয়ে যায়নি সে তা দেখেছে। মিঃ আরফান উল্লাহ যখন জ্যোছনা রায়ের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–মিঃ চৌধুরী, মিস রায় কি চলে গেছে?

বনহুর জবাব দেবার পূর্বেই বেশ কড়া মেজাজে বলে উঠেছিলো আতিয়া–জ্যোছনা রায়ের খোঁজ উনি কি করে বলবেন? খুঁজে দেখোগে আব্বা। তোমাদের ছবির হিরোইন শেষে হারিয়ে না যায়!

বনহুরের মনে কথাটা যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিলো। একটা ঘৃণার ভাব তার অন্তরে খোঁচা দিতে শুরু করেছিলো, তবে কোনো কথাই আর বলেনি বনহুর তখন।

আতিয়া যখন পুনরায় বলেছিলো–মিঃ চৌধুরী, অমন হয়ে পড়লেন কেন?

বনহুর হেসে বলেছিলো–আতিয়া, ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার একটু দরকার আছে। ফিরতে বিলম্ব হবে। তুমি বরং আজ তোমার আব্বার সঙ্গে যাও। কিন্তু মনে রেখো, কাল সকালে তোমার জন্য চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করবো।

বনহুরের মুখের কথাগুলো তার কানে মধু বর্ষণ করলো। অন্যদিন হলে আপত্তি করে বসতো–তা হবে না, চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু আজ আতিয়া সে ব্যাপারে কোনো কথা বললো না।

একটু হেসে বললো–নিশ্চয়ই আসবো মিঃ চৌধুরী। তারপর পিতাকে লক্ষ্য করে বললো আতিয়া–আব্বা, ওনার আজ একটু কাজ আছে। চলো, আমরা যাই।

আরফান উল্লাহ কি যেন ভেবে বললেন–আমারও কিছু কাজ আছে। বাসায় ফিরতে দেরি হবে, তুমি বরং একাই যাও মা।

আতিয়া হাসিমুখে বললো–বেশ, আজ তোমরা না গেলে, আমিই চললাম।

ভ্যানিটি দুলিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়ালো আতিয়া।

আরফান উল্লাহ বনহুরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন–স্টুডিওর অফিসে আমার কাজ আছে। চলি, গুড বাই!

বনহুর অস্ফুটকণ্ঠে বললো–গুড বাই।

সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যোছনা রায়। বনহুরের সাথে বিগত দিনের স্মৃতি মন্থন করে চলেছে সে।

❑

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার কখন যে জমাট বেঁধে উঠেছে খেয়াল নেই জ্যোছনা রায়ের।

হঠাৎ চমকে উঠলো জ্যোছনা রায়, কে যেন পাশে এসে দাঁড়ালো বলে মনে হলো তার। বললো জ্যোছনা রায়–কে?

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর–আমি।

আপনি এখানে কেন?

জ্যোছনা, এখনও তোমার দিব্যচক্ষু খুললো না?

অরুণ বাবু, আমি আপনার কোন কথা শুনতে রাজি নই।

কবেই বা তুমি আমার কথা শুনেছো বা শুনতে রাজী হয়েছো?

জ্যোছনা রায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–আমাকে কোনো কথা বলে লাভ হবে না অরুণ বাবু।

চাপাস্বরে হেসে উঠলো অরুণ কুমার, তারপর হাসি থামিয়ে বললো–জ্যোছনা, ভুল করে আলেয়ার আলোর পেছনে ধাওয়া করো না। মিঃ চৌধুরী তোমাকে চায় না, আর তুমি তার জন্য পাগল। হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্ভুত মেয়ে তুমি!

জ্যোছনা রায় অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো অরুণ কুমারের দিকে, তারপর দ্রুত চলে যাচ্ছিলো, অরুণ কুমার খপ্ করে ধরে ফেললো জ্যোছনা রায়ের হাত–জ্যোছনা, আজ তোমাকে ছাড়ছি না।

ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি।

কিছুতেই ছাড়বো না।

আমি চীৎকার করবো।

স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ নেই এদিকে।

ছেড়ে দিন, নইলে ভাল হবে না বলছি।

ভাল আর কবে হলো, জানি হবেও না কোনোদিন। জ্যোছনা রায়কে জোর করে টেনে নিয়ে চললো অরুণ কুমার স্টুডিওর গেটের দিকে।

জ্যোছনা রায় চীৎকার করে উঠলো–বাঁচাও, বাঁচাও.....

ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন অন্ধকারে দ্রুত এসে চেপে ধরলো অরুণ কুমারের গলা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়লো তার নাকের ওপর।

অরুণ কুমার টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো মাটিতে।

জ্যোছনা রায় দাঁড়িয়ে রইলো থ' মেরে।

আক্রমণকারী পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লো অরুণ কুমারের ওপর। চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

ইতিমধ্যে জ্যোছনা রায়ের আর্তচীৎকারে স্টুডিওতে যে দু'তিন-জন তখনও কর্মরত ছিলো, তারা ছুটে এলো ব্যস্তভাবে।

যে স্থানে এই ঘটনা ঘটেছিলো সেই স্থানটি ছিলো সম্পূর্ণ অন্ধকার। কয়েকজন টর্চলাইট নিয়ে ছুটে এলো সেখানে। আলো জ্বলতেই চক্ষুস্থির সকলের। দেখলো সবাই, অরুণ কুমারের বুকে বসে তার টুঁটি টিপে ধরেছে মিঃ চৌধুরী।

মুখে আলো পড়তেই মিঃ চৌধুরী মানে দস্যু বনহুর উঠে দাঁড়ালো, রাগে অধর দংশন করছে সে।

দু'জন লোক এগিয়ে গিয়ে অরুণ কুমারকে উঠিয়ে শরীরের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগলো। নাক দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো তার। ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো অরুণ কুমার বনহুর আর জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে।

জ্যোছনা রায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত।

বনহুরের মুখোভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। সে গুটানো জামার আস্তিন খুলে নিচ্ছিলো।

এমন সময় অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলেন আরফান উল্লাহ। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–এসব কি কাণ্ড? তারপর জ্যোছনা রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন–আপনি এখনও স্টুডিওতে ছিলেন মিস রায়? আমরা মনে করেছি চলে গেছেন।

অরুণ কুমার গায়ের ধুলো ঝাড়ছিলো। তার চোখেমুখে হিংস্র ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর ও জ্যোছনা রায়কে দেখে নিচ্ছিলো সে, দু'চোখে যেন অগ্নিবাণ বর্ষিত হচ্ছে অরুণ কুমারের। অন্যান্য কারও মুখে কোনো কথা নেই। আরফান উল্লাহর আগমনে উপস্থিত সকলেই নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিলো। কারণ, তার সামনে কে কোন্ কথা বলে অপরাধী হবে!

আরফান উল্লাহ গর্জন করে উঠলেন–মিঃ কুমার, আপনাকে বারণ করা সত্ত্বেও আপনি স্টুডিওতে কেন এসেছেন?

জবাব দিতে আমি রাজী নই। কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো অরুণ কুমার।

জ্যোছনা রায় তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর জ্যোছনা রায়ের দিকেই তাকিয়ে ছিলো। দৃষ্টি বিনিময় হতেই চোখ নামিয়ে নিলো জ্যোছনা রায়।

আরফান উল্লাহ বললেন–চলুন মিস রায়, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

জ্যোছনা রায় বললো–আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না মিঃ উল্লাহ। আমি একাই বাসায় ফিরে যেতে পারবো। জ্যোছনা রায় আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

আরফান উল্লাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–পথে না আবার কোনো বিপদ ঘটে! আসুন মিঃ চৌধুরী, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, নইলে পাজি অরুণ বাবু কি যে কাণ্ড করে বসতো!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন আরফান উল্লাহ ও বনহুর। স্টুডিওর দিকেই এগুচ্ছেন তাঁরা।

এমন সময় নাহার চৌধুরী ব্যস্তসমস্তভাবে সামনে এসে দাঁড়ালেন–এই যে মিঃ চৌধুরী, কি একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেলো!

বিশ্রী ঘটনা নয় মিঃ নাহার, অতি মনোরম.....কথাটা বললো বনহুর।

মিঃ আরফান বললেন–মিঃ নাহার চৌধুরী, আমাদের কাজ আর কতদিনে শেষ হতে পারে?

আমার মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই সুটিং শেষ হবে। বাকী কাজ শেষ হতে মাসখানেক লাগবে।

আরফান উল্লাহ বললেন–হুঁ, জ্যোছনা রায়ের শেষ শট্ কবে নাগাদ শেষ হচ্ছে?

মিস রায়ের আর একদিন সুটিং আছে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে...তাহলেই ওর কাজ শেষ!

বনহুর আর বিলম্ব না করে আরফান উল্লাহ্ এবং নাহার চৌধুরীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর জানে, জ্যোছনা রায় আরফান উল্লাহর গাড়িতে এসেছিলো। কাজেই ফিরবার পথে ভাড়াটে গাড়ি ছাড়া তার উপায় নেই। শহর ছেড়ে স্টুডিও বেশ দূরে, কাজেই সব সময় সেখানে গাড়ি পাওয়া মুশকিল। স্টুডিও ছেড়ে বেশ খানিকটা পথ চলার পর তবেই গাড়ি মিলবে। বনহুর বুঝতে পারে, জ্যোছনা রায় এখনও গাড়ির স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে পারেনি।

বনহুর নিজে রাগ করে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলো। স্পীডে চালিয়ে যেতে যেতে পথের দু'পাশে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। দুশ্চিন্তায় মনটা ভরে উঠলো বনহুরের। জ্যোছনা রায়ের এভাবে একা যাওয়া কি উচিত হয়েছে? জানে না সে— তার বিপদ এগিয়ে আসছে।

অরুণ বাবু তাকে পুনরায় আক্রমণ করেছে কিনা কে জানে!

বনহুর এসব চিন্তা করছিলো, আর পথের দু'পাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো!

অনেকটা পথ চলে গেলো বনহুর, কোথাও জ্যোছনা রায়ের সন্ধান পাওয়া গেলো না। আর কিছু দূরেই গাড়ির স্ট্যান্ড। এমন সময় হঠাৎ বনহুর দেখলো অদূরে একটা তরুণী এগিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জ্যোছনা রায় ছাড়া অন্য কেউ নয়। বনহুর গাড়ি নিয়ে তার পাশে গিয়ে ব্রেক কষে থামিয়ে ফেললো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো জ্যোছনা রায়।

বনহুর ঝুঁকে বললো–আসুন মিস রায়।

দরকার হবে না, স্ট্যাণ্ডে এসে গেছি।

মিস রায়, আপনার এ সময় ভাড়াটে গাড়িতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। আসুন।

জ্যোছনা রায় কেন যেন আজ অভিমান করতে পারলো না, বনহুরের পাশে উঠে বসলো।

গাড়ি পুনরায় ছুটতে শুরু করলো।

বেশ কিছুক্ষণ উভয়েই নিশ্চুপ রইলো!

প্রথম কথা বললো বনহুর–মিস রায়, রাগ করেছেন?

না।

মিথ্যা বললেন আপনি!

কোনো জবাব দিলো না জ্যোছনা রায়। মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো চুপ করে।

বললো আবার বনহুর–আপনি বড্ড অবুঝ মিস রায়। আপনি অভিনয় করেন, কিন্তু অভিনয় বোঝেন না।

জ্যোছনা রায় তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

লাইট পোস্টের আলোতে উভয়েরই চোখাচোখি হলো। বনহুর বললো–মিস রায়, একমাত্র আমার জন্য আজ আপনি বিপদগ্রস্ত। বলুন, তাই নয় কি?

জ্যোছনা রায় এবারও কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর বলে চললো–সত্যি করে বলছি, আমি আতিয়ার সঙ্গে শুধু অভিনয় করে চলেছি। কিন্তু কেন জানেন? শুধু আপনার জন্য।

আমার জন্য!

হাঁ, শুধু আপনার জন্য। মিস রায়, সব কথা ঐ দিন বলবো যেদিন আমাদের ছবির কাজ শেষ হবে।

জ্যোছনা রায় নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো! একটু পূর্বেই মিঃ চৌধুরীর অন্তরের পরিচয় সে পেয়েছে। মিঃ চৌধুরীই তাকে রক্ষা করেছেন, নইলে কি যে হতো! কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো জ্যোছনা রায়ের মন!

বনহুর জ্যোছনা রায়কে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো নিজের বাসায়।

গোটা রাত ঘুমাতে পারলো না সে।

কত কথা আজ বনহুরের মনের আকাশে ভেসে উঠে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো।

স্বদেশে ফিরবার জন্য মন তার আকুলি-বিকুলি করছে।

বহুদিন বাইরে কাটালো সে। নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে সে। না জানি তার আস্তানার অবস্থা কি। রহমান তার অনুপস্থিতিতে কি করছে। তারা কেমন আছে। মায়ের কথা স্মরণ হতেই অশ্রুসজল হলো বনহুরের চোখ দুটো। মনিরা কেমন আছে, নিশ্চয়ই সে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে পড়েছে। মনিরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বনহুরের মন চঞ্চল হয়ে পড়লো।

এদিকে নূরীর চিকিৎসার আশু প্রয়োজন।

আস্তানায় ফিরে না গেলে কিছুই হচ্ছে না।

ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় নতুন এক পথে পা বাড়িয়েছিলো সে। দস্যু হয়ে চিত্রনায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছবির কাজ শেষ, এবার তার ছুটি।

কিন্তু স্বদেশে ফিরে যাবার পূর্বে আর একটা কাজ তাকে করে যেতে হবে। জ্যোছনা রায়কে বুঝিয়ে দিতে হবে, সে স্বাভাবিক মানুষ নয়। বনহুরকে পাবে না কোনোদিন, কারণ সে দস্যু-মানুষ নামের কলঙ্ক।

❑

কয়েক দিন কেটে গেলো।

আজ 'কুন্তিবাঈ' ছবির শেষ সুটিং চলছে।

নাহার চৌধুরী অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছেন।

ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবুর অবস্থাও তাই। আজ তিনি যেন বেশি করে ঝুঁকে পড়েছেন কাজে। ইউনিটের প্রায় সবাই আজ এসেছেন স্টুডিওতে।

বনহুর আর জ্যোছনা রায়ের মধ্যে শেষ শট নেওয়া হবে। বনহুর আর জ্যোছনা রায় মেকআপ নিচ্ছে।

আজ ওদের দু'জনকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। বিশেষ করে মিস জ্যোছনা রায়কে আজ মেকআপে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

সুটিং শুরু হলো।

সেটে বনহুর আর জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনা রায়ের মন থেকে সব অভিমান মুছে গিয়েছিলো।

একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ গোটা অন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলো তার।

বনহুরও আজ জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে অপূর্ব অভিনয় করলো।

ছবির শেষ দৃশ্য নাহার চৌধুরীর মনে এনে দিলো অফুরন্ত আনন্দ ও পরিতৃপ্ত।

পরিচালক নাহার চৌধুরী বনহুর আর জ্যোছনা রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন।

বনহুর অবাক হলো—আজ শেষ সুটিংয়ের দিন অথচ মিঃ আরফান উল্লাহ স্টুডিওতে নেই। মিস আতিয়া ছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণ বসার পর সরে পড়েছে সে। বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের অভিনয় সহ্য করতে পারেনি।

সুটিং আজ থেকে শেষ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো জ্যোছনা রায়। স্টুডিওর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলো। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ মনটা তার বেশ স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। মিঃ চৌধুরী সম্বন্ধে তার অন্তরে যে একটা দ্বন্দ্ব ছিলো সেটা মুছে গেছে তার মন থেকে।

মিঃ চৌধুরী লোককে দেখান তিনি আতিয়াকে ভালবাসেন কিন্তু সে কথা তাঁর মনের কথা নয়। আতিয়াকে মিঃ চৌধুরী কখনও ভালবাসতে পারেন না। ধন, সম্পদ, অর্থই সবচেয়ে বড় কথা নয়। অন্তর বলে একটা জিনিস আছে, যা কোনদিন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে পুর্ণ হয় না। তাছাড়া মিঃ চৌধুরীকে সে এতদিন বেশ ভালো করেই জেনেছে, অর্থের লালসা তার নেই। নিজেই তিনি একটা ঐশ্বর্যের সম্ভার।

মিস জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। বিশ্রামকক্ষে আসার পূর্বে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তার কয়েক মিনিট কথা হয়েছে। নির্জন রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো মিঃ চৌধুরী ও জ্যোছনা রায়।

আজ থেকে কাজ শেষ মিস রায়। বলেছিলো বনহুর।

হাঁ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জবাব দিয়েছিলো জ্যোছনা রায়।

কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে বলেছিলো বনহুর–যা বলার আজ বলবো মিস রায়। কারণ আবার কখন কোথায় দেখা হবে কে জানে!

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেছিলো জ্যোছনা রায়–কেন?

বলে চলে বনহুর–আতিয়াকে আমি ভালবেসেছিলাম শুধু আপনাকে রক্ষা করার জন্য। কারণ আমি সবাইকে দেখাতে চেয়েছি–আমি আতিয়ার প্রেমে আত্মহারা, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে আমার অভিনয়ের সম্বন্ধ ছাড়া কোনো সম্পর্ক নেই। মিস রায়, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, মিস আতিয়ার সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা দেখেছেন তা শুধু অভিনয় ছাড়া কিছু নয়....

মিঃ চৌধুরী!

হাঁ, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। মিস আতিয়াকে আমি কোনো দিন ভালবাসিনি–ভালবাসতে পারিনি।

অনাবিল একটা আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিলো জ্যোছনা রায়ের হৃদয় আকাশে। গভীর আবেগে হারিয়ে ফেললো সে নিজের সত্তা, বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো–মিঃ চৌধুরী, আমাদের অভিনয় তো সত্য?

বনহুরের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে চলে গেলো স্টুডিওর ওদিকে একটা শার্শীর ফাঁকে....একজোড়া চোখ দ্রুত সরে গেলো শার্শীর ফাঁক থেকে।

বনহুর চট করে জ্যোছনা রায়কে সরিয়ে দিতে পারলো না, মোহগ্রস্তের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো.....

জ্যোছনা রায় বিশ্রামকক্ষে বসে তখনকার কথাগুলোই স্মরণ করলো। আজ তার মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে, স্বচ্ছ নির্মল হয়েছে তার হৃদয়। মিঃ চৌধুরী মিস আতিয়াকে ভালবাসেননি, বাসতে পারেন নি....

বনহুর স্টুডিওর অন্যান্য কাজ শেষ করে গাড়ির দিকে এগুতেই মনে পড়লো জ্যোছনা রায়ের কথা। কথা দিয়েছিলো, তাকে নিয়ে তবে বাসায় ফিরবে।

বনহুর মিঃ আরফান উল্লাহ, পরিচালক নাহার চৌধুরী ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবু এবং অন্যান্য সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পা বাড়ালো জ্যোছনা রায়ের বিশ্রামকক্ষের দিকে।

ছবির কাজ আজ থেকে সমাধা হলো, এবার নিশ্চিন্ত হলো বনহুর। শুধু স্টুডিও থেকেই বিদায় নিচ্ছে না, বিদায় নিচ্ছে চলচ্চিত্র থেকে। অভিনয় শুধু

সে ক্যামেরার সামনেই করেনি, অভিনয় করেছে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে। আপন মনেই হাসলো বনহুর...দস্যু বনহুর হয়েছে চিত্রনায়ক।

দ্রুত প্রবেশ করলো সে জ্যোছনা রায়ের বিশ্রামকক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটধ্বনি করে থমকে দাঁড়ালো–উঃ!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো বনহুর–সোফায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছে মিস জ্যোছনা রায়। বুকে একটা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে। লাল টকটকে তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে বক্ষবসন। কিছুটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে কার্পেটের ওপর। চোখ দুটো খোলা, তাকিয়ে আছে যেন সামনের দিকে।

বনহুর মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে এলো খানিকের জন্য। প্রাণহীন জ্যোছনা রায়ের কপালে হাত রাখলো–মিস রায়, আপনার কাজ শেষ হয়েছে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে দিলো ওর।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুটো চোখ শার্শির ফাঁকে ভেসে উঠে সরে গেলো।

বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো শার্শীর চোখ দু'টির সাথে। এমন সময়ে বাইরে পদশব্দ শোনা গেলো!

বনহুর ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে পেছনে খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন নাহার চৌধুরী–মিস রায়, চলুন মিঃ উল্লাহ আপনাকে ডাকছেন–কথা শেষ করেই আর্তচীৎকার করে উঠলেন তিনি–খুন, খুন, খুন....

চারদিক থেকে ছুটে এলো লোকজন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আরফান উল্লাহ, ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবু এবং ইউনিটের সবাই জ্যোছনা রায়ের বিশ্রামকক্ষে এসে জড়ো হলেন। সকলেরই চোখেমুখে ভীত উৎকণ্ঠা ভাব। সবাই স্তম্ভিত হতবাক। জ্যোছনা রায় কেন খুন হলো, কে তাকে খুন করলো, কি করে খুন হলো–কিন্তু কে জবাব দেবে এই হত্যা রহস্যের? যে তাকে খুন করেছে সেই জানে আর জানে মৃত জ্যোছনা রায়।

আপন কক্ষে পায়চারী করছে বনহুর।

মুখমণ্ডল গম্ভীর। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে অধর দংশন করছে সে। মিস জ্যোছনা রায়ের হত্যাকাণ্ড নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন সে।

কে এই নির্মম হত্যাকারী যে একটা নিস্পাপ ফুলের মতো জীবন চিরতরে বিনষ্ট করে দিলো? কার ঐ চোখ দুটো যা সর্বক্ষণ জ্যোছনা রায়কে অনুসরণ করতো? ঐ চোখ দু'টি যার সেই যে জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কার ঐ চোখ দুটো....বনহুর পায়চারী করছে আর মনোযাগ দিয়ে স্মরণ করছে, কার ঐ চোখ দুটো?

পুরুষের না নারীর!

ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িটা রাত বারোটা ঘোষণা করলো।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো। পাশের কামরায় ঘুমিয়ে আছে নূরী। ইয়াসিন ছাড়া চাকর বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ড্রয়ার খুলে রিভলবার বের করে আনলো বনহুর, প্যান্টের পকেটে রেখে চাবির গোছা তুলে নিলো হাতে–আলমারী খুলতে যাবে, এমন সময় বাইরে মোটর থামার শব্দ হলো।

বনহুর তাড়াতাড়ি আলমারীর চাবি বন্ধ করে শয্যায় এসে শুয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

এমন সময় ইয়াসিন এসে দরজার বাইরে থেকে বললো–সাহেব, মালিক আইছেন।

বনহুর ধড়মড় করে উঠে বসলো—বলো গিয়ে আসছি।

চলে যায় ইয়াসিন।

বনহুর দ্রুত শরীরের পোশাক পাল্টে নাইট ড্রেস পরে নেয়। তারপর চুলগুলো আংগুল দিয়ে এলোমেলো করে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখোভাব স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করে। আরফান উল্লাহ যেন বুঝতে না পারেন জ্যোছনা রায়ের হত্যাকাণ্ডের কথা সে জানে।

স্লিপিং গাউনটা পরে নিয়ে বেল্টের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে বনহুর। সে যেন হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানে না, এমন স্বাভাবিক ভাব মুখে ফুটিয়ে তোলে।

হলঘরে প্রবেশ করতেই বনহুর দেখতে পেলো হলঘরের মেঝেতে উৎকণ্ঠিত এবং ব্যস্তভাবে পায়চারী করছেন আরফান উল্লাহ। মুখোভাব গম্ভীর থমথমে, আষাঢ়ের আকাশের মতোই অন্ধকার।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো–হ্যালো মিঃ উল্লাহ, আপনি!

আরফান উল্লাহ ফিরে তাকালেন বনহুরের মুখে, ঢোক গিলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–মিঃ চৌধুরী, বড় দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ! বনহুর চোখে মুখে বিস্ময় টেনে বললো।

হাঁ, মিস জ্যোছনা রায় নিহত হয়েছেন।

কি বললেন, মিস রায় নিহত হয়েছেন!

হাঁ।

তার কাজ হয়ে গেছে–কথাটা বলে বনহুর আরফান উল্লাহর মুখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

আরফান উল্লাহ বনহুরের কথায় যেন একটু চমকে উঠলেন।

বনহুর বললো–বসুন মিঃ উল্লাহ।

আরফান উল্লাহ বসে পড়লেন একটা সোফায় ধপ্ করে।

বনহুরের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, বললো যে– একটা উজ্জ্বল তারকা খসে পড়লো চিরতরে।

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আপনি সত্য কথা বলেছেন। জ্যোছনা রায় একটা দীপ্ত প্রতিভা ছিল।

কে সেই দীপশিখা নিভিয়ে দিলো বলতে পারেন?

আমি–আমি কেমন করে বলবো মিঃ চৌধুরী?

সে কথা সত্য, আপনি কি করে বলবেন মিস রায়ের হত্যাকারী কে। কিন্তু আমি জানি কে তাকে হত্যা করেছে।

আপনি–আপনি জানেন? জানেন কে জ্যোছনা রায়কে হত্যা করেছে?

জানি। কারণ আমি জানতাম, মিস রায় নিহত হবে।

জানতেন!

হাঁ, জানতাম মিঃ উল্লাহ। আপনি ঐ কক্ষের শার্শীর ফাঁকে দেখুন, হত্যাকারী ঐ কক্ষে আছে। বনহুর পাশের কক্ষে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

মিঃ উল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

হাঁ, সেই দু'টি চোখ।

ফিরে এলো বনহুর ড্রইংরুমে।

কয়েক মিনিট পর এলেন আরফান উল্লাহ–ও ঘরে তো কাউকে দেখলাম না মিঃ চৌধুরী?

আশ্চর্য! একটু পূর্বেই তো আমি ও ঘরে অরুণ বাবুকে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম।

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন আরফান উল্লা—অরুণ বাবু! একটু থেমে বললেন–আমারও ঐ রকম সন্দেহ হয়েছিলো।

কিন্তু এই হত্যার মূল কারণ আমি।

আপনি! বলেন কি মিঃ চৌধুরী!

যা সত্য তাই বলছি মিঃ উল্লাহ, আমিই জ্যোছনা রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী!

আরফান উল্লাহ অবাক কণ্ঠে বললেন–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

বুঝতে পারবেন, যেদিন হত্যাকারী আপনার সামনে উপস্থিত হবে।

অরুণ বাবুকে আমারও সন্দেহ হয়েছিলো প্রথম থেকে। কারণ সে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে।

বনহুর একটা শব্দ করলো–লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে?

হাঁ, পুলিশ তদন্তের পর লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তার বাড়িতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে? মানে মিস জ্যোছনা রায়ের বাড়িতে তার হত্যার সংবাদ দিয়েছেন?

হাঁ, তার মা এসেছিলেন আহা, বেচারী একেবারে পাগলিনী হয়ে পড়েছেন।

বনহুর কোনো কথা বললো না।

আরফান উল্লাহ বলে চলেছেন–মিস জ্যোছনা রায়কে হারিয়ে আমি অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। আমার ব্যবসারও ভীষণ ক্ষতি হলো ওকে হারিয়ে।

না হলে আপনি এত রাতে আসবেন কেন? যাক, যা ওর ভাগ্যে ছিলো হয়ে গেছে।

হাঁ সে কথা অবশ্য সত্যি। অমন হিরোইন আর পাবো কিনা সন্দেহ।

তা মিস আতিয়া.....

ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা নয়, আপনার পরবর্তী ছবির হিরোইন হবে আতিয়া।

আর হিরো?

আমি, আমিই আতিয়ার বিপরীতে কাজ করবো! মিঃ উল্লাহ, সেই ছবি হবে অদ্ভুত–অপূর্ব! সে ছবি বক্স অফিস হিট করবে!

আনন্দের আতিশয্যে অস্ফুটধ্বনি করলেন আরফান উল্লাহ–মিঃ চৌধুরী!

যা গেছে তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, আপনি আগামী ছবির জন্য প্রস্তুত হোন মিঃ উল্লাহ।

আমি আনন্দে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছি মিঃ চৌধুরী। পরবর্তী ছবিতে আপনি যত টাকা চাইবেন দেবো! যা চাবেন পাবেন।

ভ্রুকুঞ্চিত করে আরফান উল্লাহর মুখে তাকিয়ে রইলো বনহুর।

খুশিতে দুলে উঠছে আরফান উল্লাহর ভুঁড়িটা।

বনহুর বললো এবার–মিঃ উল্লাহ, রাত বেড়ে আসছে।

হাঁ, দুটোর বেশি হয়ে গেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন আরফান উল্লাহ।

বনহুর হাই তুলে উঠে দাঁড়ালো–মিস আতিয়াকে সকালে আসতে বলবেন, কথা আছে তার সঙ্গে।

আচ্ছা, নিশ্চয়ই বলবো। খুশিতে আরফান উল্লাহর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বনহুর আরফান উল্লাহকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

বাড়ি ফিরে আরফান উল্লাহ নিশ্চিন্ত মনে শয্যা গ্রহণ করলেন। রাজপ্রাসাদের মত মস্ত বাড়ির দ্বিতল একটা কক্ষে দুগ্ধফেননিত বিছানায় গা ঢেলে দিলেন আরফান উল্লাহ। রাত তখন চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। শিয়রে আলমারী। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিদিন আলমারীতে এসে জমা হচ্ছে। অর্থলোভী আরফান উল্লাহ দু'লাখ টাকা মূল্যের সোনা মধুগঙ্গার বুকে হারিয়ে উম্মাদ হয়ে উঠলেন–আরও অর্থ চাই তার, আর চাই মিঃ চৌধুরীকে–এমন সুপুরুষ যুবককে তার প্রডাকশনের প্রতিটি ছবির নায়ক রূপে পেলে অর্থের কোনো অভাব হবে না। হিরো পাওয়া খুব মুশকিল নয়, অর্থ হলে সব হয়। শুধু ছবির হিরোর জন্য আরফান উল্লাহ ব্যস্ত নন–তার একমাত্র আদরিণী কন্যার জামাতারূপেও মিঃ চৌধুরী অপূর্ব!

মিঃ চৌধুরী অনেকখানি নমনীয় হয়ে এসেছে। আতিয়াকে এবার সে বিয়ে করতে রাজী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পাশের কামরায় আতিয়া তখন বিছানায় ঘোৎ ঘোৎ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন গুড় গুড় করে আষাঢ়ে মেঘ ডাকছে।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন আরফান উল্লাহ। বালিশের তলায় আলমারীর চাবির গোছা একবার হাত দিয়ে দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর নিশ্চিন্তে চোখ দুটো বন্ধ করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন জানালার শার্শী খুলে গেলো। সারা শরীরে জমকালো পোশাক পরিহিত, মুখে মুখোশ, দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, কক্ষে প্রবেশ করলো এক ব্যক্তি।

একটা শব্দ হতেই আরফান উল্লাহ বিছানায় দ্রুত উঠে বসলেন, ফিরে তাকাতেই বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

ততক্ষণে জমকালো পোশাক পরিহিত মূর্তি ছোরা উদ্যত করে আরফান উল্লাহর সামনে এসে দাঁড়ালো।

ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললেন আরফান উল্লাহ–কে তুমি?

গম্ভীর চাপা কণ্ঠস্বর জমকালো মূর্তির–যমদুত!

ঢোক গিলে বললেন আরফান উল্লাহ–কি চাও তুমি?

জানতে চাই জ্যোছনা রায়কে কেন তুমি হত্যা করেছো?

আমি–আমি জ্যোছনা রায়কে হত্যা করিনি!

মিথ্যা কথা বলতে চেষ্ট করোনা।

কে তুমি?

একটু পরেই আমার পরিচয় পাবে। তার পূর্বে জবাব দাও–জ্যোছনা রায়কে কেন তুমি হত্যা করেছো?

আমি তাকে হত্যা করিনি।

তুমি তাকে হত্যা করোনি?....বাম হাতে আরফান উল্লাহর টুঁটি টিপে ধরলো জমকালো মূর্তি, তার হাতের ছোরাখানা ডিমলাইটের আলোতে ঝক্ ঝক্ করে উঠলো।

আরফান উল্লাহর চোখ দুটো ছানাবড়ার মত হয়ে উঠেছে। মুখটা হা হয়ে গেছে, গোঁ গোঁ শব্দ করে বললেন–আমাকে প্রাণে মেরো না। আমাকে প্রাণে মেরো না, বলছি....বলছি....

জমকালো মূর্তি সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বাম হাত আরফান উল্লাহর গলা থেকে সরিয়ে বললো–বলো?

আমি....আমিই জ্যোছনা রায়কে হত্যা করেছি। আমিই তাকে...হত্যা..ক..রে..ছি..আরফান উল্লাহর চোখেমুখে ফুটে উঠলো খুনীর সুস্পষ্ট ছাপ।

জমকালো মূর্তি পুনরায় চাপস্বরে গর্জে উঠলো–কি অপরাধ সে করেছিলো তোমার?

অপরাধ! অপরাধ...সে...থামলেন আরফান উল্লাহ।

জমকালো মূর্তি দাঁতে দাঁত পিষে বললো–একটা কথা মিথ্যা উচ্চারণ করলেই এই ছোরা তোমার বুকে বিদ্ধ হবে–ভুলে যেও না, তুমি যমদুতের সামনে কথা বলছো।

আরফান উল্লাহ ভয়ার্ত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন ছোরাখানার দিকে। একখানা মৃত্যুমলিন বিবর্ণ মুখ ভেসে উঠলো সেই মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে। অসহায় করুণ দু'টি নিস্পাপ চোখ। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা করুণ কণ্ঠস্বর....আপনি...আমাকে হত্যা করবেন...কি অপরাধ আমি করেছি...কোনো জবাব সে পায়নি, একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা সমূলে

বিদ্ধ হয়েছিলো জ্যোছনা রায়ের বুকে। একটা তীব্র আর্তনাদ শুধু ক্ষণিকের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলো কক্ষে-দৃশ্যটা আরফান উল্লাহর চোখে ফুটে উঠলো। ভয়বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকালেন তিনি জমকালো মূর্তির দিকে।

আরফান উল্লাহ এবার বললেন-অপরাধ সে কিছুই করেনি কিন্তু-কিন্তু.

কেন তুমি তাকে হত্যা করলে?

আমার কন্যা আতিয়ার সুখের জন্য....

বলো থামলে কেন?

মিঃ চৌধুরীকে আমার আতিয়া ভালবাসে কিন্তু মিঃ চৌধুরী ভালবাসে মিস জ্যোছনা রায়কে...তাই...তাই পথের কাঁটা আমি সরিয়ে ফেলেছি। তাই ...হত্যা করেছি ওকে...

একটানে মুখের কালো আবরণ খুলে ফেললো জমকালো মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন আরফান উল্লাহ মিঃ চৌধুরী...আপনি...

হাঁ, কিন্তু মিঃ চৌধুরী নয়..দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! আমার 'কুন্তিবাঈ' ছবির নায়ক দস্যু বনহুর! এ্যাঃ-এ্যাঃ...আপনি...আপনি-আমার আতিয়া তবে-তবে সে ভুল করেছে-কোনোদিন সে মিঃ চৌধুরীকে পাবে না?

শুধু আতিয়াই ভুল করেনি, ভুল করেছো তুমি-জ্যোছনা রায়কে হত্যা করে যে ভুল তুমি করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করো-

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাতের ছোরা সমূলে বিদ্ধ হলো 'কুন্তিবাঈ'ছবির প্রযোজক আরফান উল্লাহর বুকে। তীব্র একটা আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে গড়িয়ে পড়লেন তিনি খাটের নীচে। চীৎ হয়ে পড়ে রইলো আরফান উল্লাহ। তাজা লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো মেঝের মূল্যবান কার্পেটের ওপর।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

প্যান্টের পকেট থেকে মূল্যবান ছোট টেপ্ রেকর্ডার বের করে টেবিলে রাখলো। এতক্ষণ বনহুরের পকেটে চালু ছিলো টেপরেকর্ডার। প্রথম থেকে আরফান উল্লাহর সঙ্গে বনহুরের যে কথাবার্তা হয়েছিলো সব রেকর্ড হয়ে গেছে। এবার সুইট টিপে টেপরেকর্ডটা বন্ধ করে দিলো বনহুর।

তারপর বালিশের তলা থেকে বের করে নিলো চাবির গোছা। এগুলো আলমারীটার দিকে যার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে আরফান উল্লাহর উপার্জিত লাখ লাখ টাকা।

❑

পুলিশ অফিস।

ইন্সপেক্টারের টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে। ফোনটা বেজেই চলেছে সশব্দে।

ভোর সাড়ে পাঁচটা।

দু'জন পুলিশ পাহারারত। অফিস-ইনচার্জ ও, সি ধরলেন– হ্যালো–হ্যালো–

ওদিক থেকে ভেসে এলো দস্যু বনহুরের কণ্ঠস্বর–মিঃ আরফান উল্লাহ খুন হয়েছেন। এইমাত্র তাকে খুন করা হলো–

ওসি'র হাত থেকে রিসিভার খসে পড়তে যাচ্ছিলো, শক্ত করে ধরে বললেন তিনি–হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন? কোথা থেকে বলছেন?

ওদিক থেকে ভেসে এলো বনহুরের গলা–দস্যু বনহুর কথা বলছি। 'কুন্তিবাঈ' ছবির প্রযোজক আরফান উল্লাহর বাড়ি থেকে।

দস্যু বনহুর!

মুহূর্ত বিলম্ব না করে চলে আসুন। পুলিশ ফোর্সসহ চলে আসুন...হ্যালো, দেরী করবেন না, চলে আসুন–ওদিকে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

ওসি'র হাত কাঁপছিলো, তাড়াতাড়ি রিসিভার রেখে একটু সুস্থ হয়ে নিলেন, পরক্ষণেই আবার রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ইন্সপেক্টারকে ফোন করলেন–আরফান উল্লাহ খুন হয়েছেন। এক্ষুণি সেখানে যেতে হবে–

পুলিশ ভ্যান যখন আরফান উল্লাহর বাড়ির গেটে এসে থামলো তখনও আতিয়ার ঘুম ভাঙ্গেনি।

ওদিকে তখন দস্যু বনহুর নূরীসহ তার নতুন গাড়িখানা নিয়ে অজানা পথ ধরে স্পীডে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত ভোর হবার পূর্বেই এ শহর ছেড়ে দূরে–বহুদূরে চলে যেতে হবে তাকে।

পরবর্তী বই

কান্দাই–এর পথে দস্যু বনহুর

কান্দাই-এর পথে দস্যু বনহুর-১৬

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ডবল স্পীডে গাড়িখানা ছুটে চলেছে। ড্রাইভ্ করছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। গাড়ির পিছনের আসনে সংজ্ঞাহীন নূরী। মাঝে মাঝে বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো, আসনের নীচে গড়িয়ে পড়ে না যায়।

বনহুরের দৃষ্টি গাড়ির সম্মুখ পথে থাকলেও মনের মধ্যে নানা চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়ছিলো। ...জ্যোছনা রায়কে হত্যার জন্য বনহুর হত্যা করলো আরফান উল্লাহকে। কারণ, আরফান উল্লাহই জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারী। বনহুর যখন ষ্টুডিওতে প্রথম দিন পদার্পণ করেছিলো, সেই দিনই বিশ্রাম-কক্ষে জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে আলাপকালে দেখেছিলো দুটি চোখ। শার্শির ফাঁকে চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠে মিশে গিয়েছিলো তখনই। বনহুর জ্যোছনা রায়কে এ কথা না বলেই দ্রুত পদে গিয়েছিলো শার্শির পাশে। জানালার শার্শি খুলে লক্ষ্য করেছিলো বারান্দার চারপাশে কিন্তু কাউকেই নজরে পড়ে নি। বনহুরের সন্দেহ হয়েছিলো, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে তার মেলামেশা কেউ যেন ফলো করছে। এবং সে লোকটি অরুণ বাবু ছাড়া অন্য কেহ নয়। সেদিনের পর থেকেই বনহুর অরুণ বাবুর উপর গোপনে নজর রেখেছিলো তীক্ষ্মভাবে।

বনহুর জানতো, অরুণ বাবু জ্যোছনা রায়কে গভীরভাবে ভালবাসে, এবং সে জন্যই সে তার পিছনে লেগে রয়েছে ছায়ার মত। বনহুরের সঙ্গে জ্যোছনার মেলামেশা তার কাছে অসহ্যনীয়।

কিন্তু বনহুর শেষ পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে অনুভব করেছিলো, অরুণ বাবু জ্যোছনা রায়কে বার বার হত্যার হুমকি দেখালেও আসলে সে কোন দিন জ্যোছনা রায়কে হত্যা করতে পারতো না। কারণ, অরুণ বাবু তাকে ভালবাসতো সত্যি করে। প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দিয়েও যখন সে জ্যোছনা রায়ের কাছে এতোটুকু করুণা পায়নি, তখন সে ক্ষেপে উঠেছিলো চরম ভাবে। তখনই সে হত্যার হুমকি দেখাতেও কসুর করেনি জ্যোছনা রায়কে।

তারপর বনহুর আবিস্কার করেছিলো জ্যোছনা রায়ের আসল হত্যাকারীকে। শুধু আবিস্কার করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, নিজ হস্তে জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারীকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলো।

পুলিশের হাতেও সঁপে দিতে পারতো বনহুর আরফান উল্লাহকে। কিন্তু তা সে করে নি। কারণ, হত্যাকারী কোটিপতি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে তার কিছুমাত্র কষ্ট হতো না। পুলিশের হাত থেকে অনায়াসে সে নিজেকে মুক্তি করে নিতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই বনহুর স্বয়ং আরফান উল্লাহকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছিলো।

আরফান উল্লাহই যে জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারী, এটাও বনহুর প্রমাণ করে দিয়েছিলো পুলিশের কাছে টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে। কাজেই কে আসল খুনী সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো।

আরফান উল্লাহকে হত্যার পূর্বে বুদ্ধিমান দস্যু বনহুর টেপ রেকর্ড রেখে কথোপকথন করেছিলো তার সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছিলো তাকে, এমন কি নিজের পরিচয়টাও আরফান উল্লাহকে দিয়েছিলো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

পুলিশ যখন আরফান উল্লাহর লাশের পাশে আবিষ্কার করলো টেপ রেকর্ড, এবং টেপ রেকর্ড থেকে জানতে পারলো জ্যোছনা রায়ের আসল হত্যাকারীকে, তখন পুলিশ মহল শুধু বিস্মিতই হলোনা, স্তব্ধও হলো।

খুনীকে গ্রেপ্তারের পূর্বেই সে নিহত হয়েছে, এবং তাকে হত্যা করেছে যে ব্যক্তি, সে অন্য কেহ নয়– স্বয়ং দস্যু বনহুর।

এদিকে পুলিশ মহলে যখন জ্যোছনা রায় ও আরফান উল্লাহর হত্যাকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় শুরু হলো, ঠিক তখন দস্যু বনহুর সংজ্ঞাহীন নূরীকে নিয়ে কান্দাই-এর পথে ছুটে চলেছে।

নূরীকে সংজ্ঞাহীন করেছে বনহুর, না হলে সে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ এ ভাবে তার সঙ্গে রওয়ানা দিতে রাজি হতো না। একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসতো হয়তো সে। সেই কারণেই বনহুর এই উপায় অবলম্বন করছে।

জ্যোছনা রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বনহুর যখন তার বাসায় ফিরে গিয়েছিলো তখন নূরী নিজের কক্ষের বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলো।

বনহুর কিছু পূর্বে আরফান উল্লাহকে হত্যা করলেও ঠিক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক ছিলো, এতোটুকু পরিবর্তন আসেনি তার মধ্যে। কারণ, বনহুরের নরহত্যা নেশা না হলেও এটা তার অভ্যাসগত ব্যাপার, কাজেই বিচলিত হবার কিছুই ছিলো না বনহুরের।

নূরীর কক্ষে প্রবেশ করে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো নূরীর শয্যার পাশে। এই রাতেই তাকে এ শহর ত্যাগ করতে হবে। কাজ শেষ হয়েছে, এবার ফিরতে

হবে কান্দাই-এ। যেখানে তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে স্নেহময়ী জননী আর প্রেয়সী স্ত্রী মনিরা। কিন্তু নূরী আজ স্বাভাবিক জ্ঞানবতী নেই, তাকে পাগল বললেও ভুল হয় না। যাদুকরের কোন বিষময় ঔষধে আজ সে জ্ঞানশূন্য।

এই গভীর রাতে নূরী কিছুতেই তার সঙ্গে পালাতে রাজি হবে না সহজে। হয়তো একটা হট্টগোল বাধিয়ে বসতে পারে। তাই বনহুর নূরীকে অজ্ঞান করে তুলে নিলো হাতের উপরে।

সমস্ত বাড়িখানা ঝিমিয়ে পড়েছিলো, এমন কি বাড়ির চাকর বাকররাও ঘুমিয়ে ছিলো আরামে।

বনহুর নূরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপর তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে।

অদূরে পাইন গাছের আড়ালে দণ্ডায়মান নতুন গাড়িখানার পাশে এসে একবার সচকিতভাবে তাকিয়ে দেখে নিলো বাড়ির খানার দিকে। আজ এক বছরের কত স্মৃতি জড়ানো রয়েছে ঐ বাড়িখানায়। ক্ষণিকের জন্য একবার বনহুরের মনে ভেসে উঠেছিলো আতিয়ার মুখখানা।

গাড়ির পিছন আসনে নূরীকে শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভ আসনে এসে বসলো বনহুর। তারপর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো। বনহুর একবার পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিতে ভুললো না।

জনহীন রাজপথ বেয়ে বনহুর উল্কাবেগে গাড়ি চালিয়ে চললো। রাত ভোর হবার পূর্বেই তাকে শহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

❑

পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে।

বনহুরের গাড়ি এখন শহর ছেড়ে একটা পাহাড়ের পাশ কেটে এগুচ্ছে। এতো স্পীডে গাড়ি চালিয়ে এসেছে বনহুর যে, মাত্র কয়েক ঘন্টায় শহর ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুরের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। চুলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে।

এখনও নূরীর সংজ্ঞা ফিরে আসে নি।

ছিন্ন লতার ন্যায় পিছন আসনে লুটিয়ে আছে নূরী। এক গুচ্ছ রজনী গন্ধার মতই সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

বনহুর একটি নির্জন স্থানে গাড়ি রাখলো।

দক্ষিণ পাশে উঁচু পাহাড়।

ঝোপ-ঝাপ আর আগাছায় ভরা জায়গাটা। মাঝে মাঝে বৃহৎ বৃহৎ কৃক্ষ কালের প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। কোন কোন স্থানে বন আর গভীর জঙ্গল। এসবের পাশ কেটেই এগিয়ে গেছে একটা প্রশস্ত পথ সম্মুখের দিকে।

বনহুর ঐ পথ ধরেই গাড়ি চালাচ্ছিলো। এই এতোটা পথ আসতে তার তেমন কোন অসুবিধা বা কষ্ট হয়নি, কারণ পথটা সম্পূর্ণ পাকা না হলেও বেশ মসৃণ এবং সমতল ছিলো।

একটা শাল বৃক্ষের তলায় গাড়ি রাখলো বনহুর। প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে ললাটের ঘাম মুছে ফেললো সে। তারপর ড্রাইভ আসন থেকে নেমে এলো নীচে।

ইতিমধ্যে নূরীও চোখ মেলে তাকাচ্ছে ধীরে ধীরে।

বনহুর পিছন আসনে উঠে বসলো, নূরীর চুলে হাত বুলিয়ে ডাকলো ....নূরী!

নূরী চোখ মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। উঠে বসতে গেলো।

বনহুর নূরীকে শুইয়ে দিয়ে বললো– আর একটু শুয়ে থাকো।

নূরী চারদিকে তাকিয়ে অবাক হলো, এটাতো তার শয়নকক্ষ নয়! ঘন বন আর পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না।

নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর– নূরী, এটা তোমার কক্ষ নয়, এটা মোটর-গাড়ি।

আমি কোথায়? নূরীর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শব্দ।

বনহুর আরও একটু ঝুকে পড়লো নূরীর মুখের উপর, বললো – তুমি এখন শহরের বাইরে।

উঠে বসলো নূরী এবার, পুনরায় চারদিকে তাকিয়ে বললো সে– এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এসেছেন?

ভয় নেই, আমি তোমাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাবো।

না, আমি যাবো না আপনার সঙ্গে।

এতোদিন তো আমার সঙ্গেই আছো, কই কোনদিন তো আমার সঙ্গে কোথাও যেতে আপত্তি করোনি।

নূরী নিশ্চুপ কিছু ভাবতে লাগলো।

বনহুর বললো—নূরী, যেখানে ছিলাম সেখানে আমাদের জন্য বিপদ দেখা দিয়েছিলো, ওখানে থাকা আর সম্ভব নয়, তাই...

তাই আবার আপনি আমাকে পাহাড়ে জঙ্গলে নিয়ে এলেন। আমার কিন্তু ভয় করছে, আবার যদি ঐ যাদুকর শয়তানটা আমাকে ধরে নিয়ে যায়?

হাসলো বনহুর, ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো—নূরী, সে, শয়তান আর বেঁচে নেই, যাদুকরকে আমি হত্যা করেছিলাম।

নূরী এতোদিনে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো। বললো সে– সত্যি?

হাঁ নূরী, সত্যি। বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো। নির্নিমেষ নয়নে তাকালো সে নূরীর মুখের দিকে।

নূরীও তাকিয়ে ছিলো অপলক চোখে বনহুরের দিকে। বনহুর ব্যাকুল কণ্ঠে বললো– নূরী, আজও তুমি আমায় চিনতে পারলে না? গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তার।

নূরী অনেক বার একথা শুনেছে বনহুরের মুখে; অনেকদিন ভেবেছে– স্মরণ করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু কিছুই তার মনে পড়েনি। আজও নূরী ভাবে– কিছুতেই স্মরণ হয়না কোন কথা।

বনহুর হতাশভাবে নেমে যায় পিছন আসন থেকে।

ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়।

আবার ছুটতে শুরু করে বনহুরের গাড়িখানা।

অবিরাম এগিয়ে চলে সম্মুখের দিকে। পাহাড়ের গা- বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ। এবার সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে বনহুরকে; কারণ একটু এদিক ওদিক হলেই আর কি—হাজার ফিট নীচে গাড়িখানা পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বনহুর নূরীকে সাবধানে চুপ করে বসে থাকতে বললো।

সত্যি, বনহুর যে পথে গাড়ি চালাচ্ছিলো সে পথ অতি দুর্গম, অতি ভয়ঙ্কর পথ। এই পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কেউ জানেনা। বনহুর লোকমুখে শুনেছিলো, এ পথটা নাকি চলে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে বহু দূরে– কোন এক নগরের বুকে গিয়ে মিশেছে। আর সে পথ বেয়ে বনহুর অজানা নগরের দিকে ছুটে চলেছে।

এ পথে তেমন কোন গাড়ি বা লোকজনের আনাগোনা ছিলোনা, কাজেই বনহুরের গাড়ি চালাতে অন্য কোন বাধা সৃষ্টি হচ্ছিলো না।

বেলা ক্রমেই বেড়ে উঠছিলো, বনহুর নিজে বেশ ক্ষুধা অনুভব করলো। নূরীর যে ক্ষুধা পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত রাতে তারা আহার করেছিলো আর আজ এতো বেলা হলো কোন কিছু মুখে পড়েনি।

এমন জায়গা, – পাহাড় আর পাথর ছাড়া কিছুই নেই কোনখানে। হঠাৎ দু'একটা বৃক্ষাদি নজরে পড়ে কিন্তু সেগুলো কোন ফলবৃক্ষ নয়। বনহুর নিজের জন্য চিন্তিত না হলেও নূরীর জন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। কি করা যায়, একটু কিছু নূরীকে খাওয়াতে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতো সে।

বনহুরের গাড়ি এখন স্বাভাবিক গতিতে এগুচ্ছিলো। এখন পথটা আরও সঙ্কীর্ণ দুর্গম। অতি সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলো বনহুর।.

নূরী নিশ্চুপ বসেছিলো পিছন আসনে। মুখে তার কোন কথা নেই। বনহুর মাঝে মাঝে নূরীর সঙ্গে দু'একটা কথাবার্তা বলে তাকে উৎসাহিত করছিলো। নূরী তার কথায় দু'একটা জবাব দিলেও তেমন কোন ভাব ছিলো না তার মধ্যে বনহুর যার মধ্যে কোন আনন্দ বা উৎসাহ খুঁজে পায় না।

বনহুর ভাবছিলো, কোন রকমে একবার কান্দাই-এ নিজ আস্তানায় পৌঁছতে পারলে নূরীর চিকিৎসার সুযোগ আসবে। যাদুকর নূরীকে এমন কোন ঔষধ দ্বারা তার স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিলো যার জন্য আজও নূরী তাকে চিনতে পারছে না বা পারেনি। যে নূরী তাকে এক মুহূর্ত না দেখলে ব্যস্ত হয়ে পড়তো, একটু কথা না বললে অভিমানে মুখ ভার করে থাকতো, আজ সে নূরী—

বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়লো, একটা শব্দ ভেসে আসছে তার কানে। দূরে– বহু দূরে কোন মোটর গাড়ির শব্দ হচ্ছে যেন।

বনহুর বেশ চিন্তিত হলো। গাড়ির শব্দটা সম্মুখ দিক থেকেই যেন আসছে।

পথটা এতো সঙ্কীর্ণ, যে পাশাপাশি দু'খানা গাড়ি চলা কঠিন। কাজেই সম্মুখ দিকে কোন গাড়ি এসে পড়লে বিপদ অনিবার্য।

শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আসছে, সম্মুখের গাড়িখানা যে অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বনহুর নিজের গাড়ি থামিয়ে ফেললো, এবং নূরীকে বললো– শিঘ্র নেমে পড়ো নূরী।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলো –এসো নূরী।

নূরীকে নামিয়ে নিয়ে বনহুর পথের একধারে সরে দাঁড়ালো, শব্দটা অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে।

স্তব্ধ নিশ্বাসে বনহুর প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

গাড়ি ছেড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা সমতল স্থানে নূরীসহ বনহুর দাঁড়িয়ে রইলো। জায়গাটা ঝোঁপ-ঝাড়ে আর আগাছায় ভরা, কাজেই পথ থেকে সহজে কেউ তাদের দেখতে পাবে না।

বনহুর আর নূরী হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো, সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো:— একটা মস্ত বড় ট্রাক সাঁ সাঁ করে ছুটে এসে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলো পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের গাড়িখানায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা একটা খেলনা গাড়ির মত ছিটকে পড়লো একেবারে হাজার ফিট নীচে।

নূরী গাড়িখানার এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখে শিউরে উঠলো, দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো সে।

বনহুর নূরীর কানে মুখ নিয়ে বললো– আর একটু হলেই আমাদের অবস্থা কি হতো বলতো? ঐ গাড়িখানার মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম।

নূরী ভীত দৃষ্টি মেলে তাকালো হাজার ফিট নীচে গড়িয়ে পড়া চ্যাপ্‌টা গাড়িখানার দিকে।

বনহুর এবার বললো– খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া নূরী, আমরা শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

বনহুর এবারে তাকিয়ে দেখলো– ট্রাকখানা তাদের গাড়িটায় ধাক্কা খেয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থেমে পড়েছে। বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখলো বনহুর– ট্রাক বোঝাই করা কি সব জিনিসপত্র রয়েছে। সে সব জিনিসের উপর বসে রয়েছে কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ। লোকগুলোর দেহে অদ্ভুত ধরনের পোশাক। গায়ে ব্লু রং এর প্যান্ট, শরীরে ঐ রং এরই সার্ট, মাথায় চোঙ্গ টুপি। টুপি দিয়ে সমস্ত মাথা আর মুখ ঢাকা, শুধু চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে টুপির সম্মুখ ভাগের দুটো করে ফুটো দিয়ে।

ড্রাইভারের শরীরেও ঐ ধরনের ড্রেস। কিন্তু ড্রাইভ আসনের পাশে যে লোকটি বিশাল বপু নিয়ে বসেছিলো তার দেহের পোষাক সম্পূর্ণ আলাদা। গাঢ় সবুজ তার ড্রেস। মাথায় ক্যাপ ধরনের টুপি। চোখে গগলস। কানের এবং মুখের সংগে কোন যন্ত্র আঁটা রয়েছে বলে মনে হল বনহুরের।

প্রত্যেকটা লোকের বেল্টের সঙ্গে ছোরা ঝুলছে, দেখতে পেল বনহুর। কিছুক্ষণ তাকিয়ে বুঝতে পারলো, লোকগুলো স্বাভাবিক নাগরিক বা জনগণ নয়। এরা কোন দস্যুদল নিঃসন্দেহে। শহর বা অন্য কোথাও ডাকাতি করে ফিরে চলেছে আস্তানায়।

বনহুর নূরীকে চুপ থাকতে বলে ঝোপের আড়াল থেকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ট্রাকের আরোহীদের কার্যকলাপ দেখতে লাগলো।

লোকগুলো ততক্ষণে ট্রাক ছেড়ে পথের উপর নেমে পড়ছে।

ড্রাইভ আসন ত্যাগ করে মোটা লোকটাও নেমে পড়েছে। লোকটা ঐ দলের নেতা বা দলপতি হবে।

ওরা সবাই ঝুকে পড়ে নীচে চূর্ণ-বিচূর্ণ গাড়িখানা দেখছে। নিজেদের মধ্যে কোন কথাবার্তাও চলছে বলে মনে হলো।

বনহুর নূরীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগুলো, এবার আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। বনহুর দেখলো, দু'জন লোককে ওরা দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে রেখেছে ট্রাকে মালপত্রের সঙ্গে।

প্রখর সূর্যের তাপে লোক দু'টি কালো হয়ে উঠেছে। মুখ ও হাত পা বাধা থাকায় তারা নড়তে পারছে না বা চিৎকার করে কাঁদতে পারছে না। মাঝে মাঝে পাঁকাল মাছের মত শরীরটা কুঁকড়ে নিচ্ছে।

সর্দার বা দলপতি গলায় ঝোলানো যন্ত্রটা মুখে লাগিয়ে কি যেন বললো, তারপর আবার চেপে বসলো গাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকগুলি সবাই গাড়িতে চেপে বসলো। ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার আয়োজন করছে, এমন সময় বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে গুলী ছুড়লো ড্রাইভারটির বুক লক্ষ্য করে।

একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো বনহুর আর নূরীর কানে। ট্রাক-চালক মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে গাড়ির হ্যাণ্ডেলের উপর। মুহূর্তে ট্রাক থেকে নেমে পড়লো দলপতি।

তৎক্ষণাৎ অন্যান্য অনুচরগণ ট্রাক থেকে লাফিয়ে নীচে পথের উপর নেমে দাঁড়ালো। সকলের চোখে-মুখে বিস্ময় মনোভাব, –এই নির্জন স্থানে গুলী এলো কোথা থেকে।

দলপতির ইংগিতে সুতীক্ষ্ম ধার ছোরা হাতে খুলে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

নূরী এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ছুটে এসে বনহুরের বুকের মধ্যে মুখ লুকালো। বনহুর নূরীকে অভয় দিয়ে বললো– ভয় নেই, ওরা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

নূরী থর থর করে কাঁপছে।

মুহূর্তের জন্য বনহুরের মনে পড়লো, নূরী এত সহজে ভীত হবার মেয়ে ছিল না, সেও দস্যু দুহিতা......আর আজ এতো সামান্যে নূরী হরিণ শিশুর মতই দুর্বলমনা হয়ে পড়েছে। বনহুর নূরীকে সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় বললো– নূরী, তুমি আমার পাশে থাকতে কোন ভয় নেই।

হঠাৎ বনহুর দেখলো, দু'জন অদ্ভুত ড্রেস পরা লোক তাদের ঝোপটার দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলো, ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে– গুলীটা এদিক থেকেই গিয়েছিলো।

কিন্তু আর কিছু ভাববার সময় নাই– বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

লোক দুটি এগিয়ে আসতেই বনহুর নূরীকে এক পাশে সরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো একজনের ঘাড়ে। প্রচণ্ড এক ঘুষিতে লোকটিকে ধরাশায়ী করে পুনরায় আক্রমণ করলো দ্বিতীয় জনকে।

বনহুরের বলিষ্ঠ হস্তের মুষ্ঠ্যাঘাতে লোকদুটি কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। তাদের হাতের ছোরা ছিটকে পড়েছিলো দূরে।

লোক দুটি উঠে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়। ভূতল শয্যা ত্যাগ করে প্রথম ব্যক্তি দিল ভোঁ দৌড়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বনহুর পালাবার অবসর না দিয়ে পর পর তাকে ভূতলশায়ী করতে লাগলো।

ততক্ষণে অন্যান্য লোকগুলো দ্রুত এদিকে ছুটতে শুরু করছে–সকলের হস্তেই সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। সূর্যের আলোতে ছোরাগুলো ঝকমক করে উঠছে। এক সঙ্গে যেন কতগুলো বিদ্যুৎ লহরী ছুটে আসছে এদিকে।

বনহুর দ্বিতীয় লোকটাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে মারলো দূরে।

দলপতিসহ অন্যান্য লোকগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। লোকটা ধপ করে এসে পড়লো তাদের সম্মুখে।

দলপতি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো।

বনহুর কালবিলম্ব না করে রিভলবার উদ্যত করে ধরলো খবরদার– এগুলোই মারব।

এক সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো।

দলপতি তার মুখোসের মধ্যের চোখ দুটি দিয়ে তাকালো।

বনহুরের আজ পর্যন্ত বহু দস্যুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছে কিন্তু কারো চোখ এমন অগ্নিগোলকের মত তীব্র মনে হয় নি।

বনহুরের হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে দলপতি গর্জে উঠলো– কে তুমি?

বনহুর পাল্টা প্রশ্ন করলো– তুমি কে?

হা ঃ হা ঃ করে হেসে উঠলো দলপতি– আমাকে চেনোনা! আবার নিস্তব্ধ পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হলো সেই হাসির শব্দ, বললো দলপতি– আমার নাম কে না জানে। ডাকু হাঙ্গেরুর নাম জানোনা! আমি সেই হাঙ্গেরু ডাকু।

বনহুর একটু হেসে বললো— ওঃ তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি।

দলপতি গর্জে উঠলো– আমার গাড়ির চালককে তুমি হত্যা করলে কেন?

কেন করেছি তার জবাব পাবে এই মুহূর্তে.......

বনহুরের কথা শেষ না হতেই দলপতির ছোরা এসে বিদ্ধ হল বনহুরের বাম বাজুতে।

ডাকু হাঙ্গেরুর ছোরা এতো দ্রুত গিয়ে বনহুরের শরীরে বিদ্ধ হয়েছিলো যে, বনহুর সরে দাঁড়াবার সুযোগ পায়নি।

আহত জন্তু যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তেমনি হাঙ্গেরুর ছোরার আঘাতে হিংস্র হয়ে উঠলো দস্যু বনহুর। রিভলভার উচু করে গুলী ছাড়লো হাঙ্গেরুর বুক লক্ষ্য করে

হাঙ্গেরু বিকট একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে, সঙ্গে সঙ্গে অবাক হলো বনহুর, হাঙ্গেরুর দলবল সব যে দিকে পারে অকস্মাৎ ছুটে পালাতে লাগলো।

দলপতির মর্মান্তিক অবস্থা তার অনুচরদের একেবারে হকচকিয়ে দিয়েছে। তারা ভাবতেও পারেনি তাদের দলপতির এ অবস্থা হতে পারে। যে দিকে পারলো ছুটে পালালো।

বনহুর এবার রিভলভার পকেটে রেখে দক্ষিণ হস্তে বাম বাজু থেকে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা খানা এক টানে তুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো।

নূরী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এবার এগিয়ে এলো। বনহুরের বাজু থেকে রক্ত ঝরতে দেখে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো নূরী।

বনহুর বললো– ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো নূরী। আমার রুমালখানা দিয়ে হাতটা শক্ত করে বেঁধে দাও।

নূরী বনহুরের নির্দেশ মত কাজ করলো।

বনহুর একবার ফিরে তাকালো ডাকু হাঙ্গেরুর মৃতদেহের দিকে। তারপর নূরীসহ এগিয়ে চললো অদূরস্থ ট্রাকখানার পাশে।

ট্রাকের উপরে হাত-পা- মুখ বাধা লোক দুটি তখনও ছটফট করছে। বনহুর নিজের ব্যথা ভুলে গেলো, ট্রাকের উপর উঠে গিয়ে লোক দুটির হাত পা আর মুখের বাধন মুক্ত করে দিলো।

লোক দুটি বনহুরের দয়ায় মুক্তি লাভ করে উঠে বসলো।

বনহুর ওদের দু'জনাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে ট্রাকের ছায়ায় বসিয়ে দিলো।

লোক দু'জনার মধ্যে একজন বললো– আপনি কে? আমাদের জীবন দান করলেন।

বনহুর বললো– আমি একজন মানুষ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্‌লো– আপনি আমাদের রক্ষা না কর্‌লে আমরা মারা পড়েছিলাম আর কি। ঐ শয়তান ডাকাতের দল আমাদের সব লুটে নিয়ে, আমাদেরকেও বেঁধে আনছিলো। ওরা আমাদের আটক রেখে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে আরও অর্থ সংগ্রহ করতো।

বনহুর বললো এবার– সব খোদার দয়া, তার নিকটেই শুকরিয়া করুন।

লোক দুটির চেহারা ভদ্র এবং ব্যবসায়ী ধরনের। বনহুর বুঝতে পারলো, ট্রাকে যে মাল রয়েছে এদেরই। নিশ্চয়ই গতরাতে শয়তান ডাকু হাঙ্গেরু তার দল-বল নিয়ে এদের উপরে হামলা চালিয়ে এ সব লুটে নিয়ে এসেছে।

লোক দুটির সঙ্গে আরও কয়েকটা কথাবার্তায় বনহুর বুঝতে পারলো, এখান থেকে শহর বহু দূরে। হেঁটে যাবার কোন উপায় নেই। এ পথে কোন যান-বাহন যাতায়াত করে না, এককালে লোক চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা থাকলেও আজ আর নেই, কারণ,এ পথটা দস্যু আর ডাকুতে ছেয়ে গেছে। কচিৎ কোন গাড়ি এদিকে আর চলে না।

কাজেই কোন যান-বাহনের আশা নেই।

ট্রাকখানা কোনক্রমে ওদিকে ফেরাতে পারলেই উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত, কিন্তু ফেরাবো কি করে—, সামান্য চওড়া জায়গা হলেও বনহুরের কাছে অসাধ্য ছিলো না।

এদিকে বনহুরের বাহু দিয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণা যে না হচ্ছে তা নয়, কিন্তু এখন ব্যথায় মুষড়ে পড়লে চলবে না। নিজে বাঁচতে হবে আর এদেরকেও বাঁচাতে হবে।

বনহুর কিছু ভেবে নিলো, তারপর যে দিকে তারা এখন অগ্রসর হবে, মানে যে দিক থেকে ট্রাকখানা এসেছিলো সে দিকে এগুতে লাগলো।

হস্তপদ মুক্ত লোকদ্বয় ও নূরী দাঁড়িয়ে রইলো ট্রাকখানার পাশে।

বনহুর চলে গেলো, আর তার ফিরবার কথা নাই।

বেলা প্রায় গড়িয়ে আসছে, এমন সময় ফিরে এলো বনহুর। মুখভাব কিছুটা প্রসন্ন। প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখমন্ডল মুছে নিয়ে বললো, পেয়েছি, উপায় পেয়েছি, কিন্তু জীবন-মরণ সমস্যা।

প্রথম ব্যক্তি বললো– কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধূয়া নির্গত করে বললো– গাড়ি ফেরানোর মত খানিকটা জায়গা আবিষ্কার করে তবেই ফিরলাম। নিন, আপনারা গাড়িতে চেপে বসুন, আমি গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রথম ব্যক্তি বললো– যে দুর্গম পথ, গাড়ি ব্যাক করা কি সহজ হবে? হঠাৎ যদি পড়ে যায়?

তাহলে মৃত্যু। বললো বনহুর।

শিউরে উঠে বললো দ্বিতীয় ব্যক্তি– কাজ নেই, হেঁটেই চলুন।

যে ক'দিন লাগে লাগবে।

বনহুর তার কথা শুনে হাসলো, তারপর বললো– আচ্ছা, আপনারা হাঁটতে শুরু করেন, আমি গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে যাচ্ছি।

বনহুর গাড়ির ড্রাইভ্ আসনে উঠে বসলো।

স্তব্ধ নিশ্বাসে লোক দুটি তাকিয়ে রইলো তাদের মূল্যবান সামগ্রী সহ গাড়িখানার দিকে।

বনহুর গাড়িখানা সাবধানে ব্যাক করে নিয়ে চললো। লোক দু'জন ও নূরী চলতে লাগলো গাড়িখানাকে অনুসরণ করে।

অতি কৌশলে আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পাহাড়ে পথ দিয়ে বনহুর নিপুণতার সঙ্গে গাড়ি ব্যাক করে চালিয়ে চললো। হঠাৎ যদি একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায় তাহলেই গাড়িখানা গড়িয়ে পড়ে যাবে হাজার ফিট নীচে, পাথরের উপরে।

অদ্ভুত সাহসী দস্যু বনহুর– এই দুর্গম পথে গাড়ি পিছন দিকে চালিয়ে নিতে এতোটুকু ঘাবড়ে গেলোনা বা বিচলিত হলোনা। নির্ভীক সৈনিকের মত সে স্থিরভাবে গাড়ি ড্রাইভ করে চললো।

পাহাড়ের গা ঘেষে সঙ্কীর্ণ পাথুরে পথ, তাও সমতল নয়, মাঝে মাঝে বেশ উঁচু নীচু। একবার হঠাৎ গাড়িখানা কাৎ হয়ে গিয়ে ছিলো আর কি,

বনহুর অতি সাবধানে কোন রকমে সামলে নিলো। সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে ওর। সুন্দর মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠেছে ভীষণ ভাবে। জীবনে বনহুর অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে, কিন্তু আজকের মত এমন সঙ্কটময় পথ তার জীবনে এই যেন প্রথম।

প্রায় ঘন্টা কয়েক চলার পর তার নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

গাড়িখানা রেখে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, জায়গাটা আর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। এ স্থানে পাহাড়ের গা কিছুটা ঢালু তবে সম্পূর্ণ প্রশস্ত নয়। গাড়ি কোন রকমে ব্যাক করে ঘুরিয়ে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু হঠাৎ যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নাই।

বনহুর যখন ভাবছে– কিভাবে গাড়িখানা ব্যাক করে সামনের দিকে মুখ ফেরাবে, ঠিক তখন কতগুলো অসভ্য জংলী লোক হুম হুম করে এগিয়ে এলো পাহাড়ের গা বেয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে।

বনহুর এই মুহূর্তে এমন কিছু আশা করে নেই। কিন্তু তাকে তখনই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে হলো, বিলম্ব করার সময় ছিল না।

কতগুলো জংলী এক সঙ্গে ছুটে এলো তার দিকে। বনহুর রিভলভার উদ্যত করে গুলী ছুঁড়লো একজন জংলীর বুক লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো, তারপর গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো বনহুরের পায়ের কাছে।

বনহুর আর একজনকে লক্ষ্য করবার পূর্বেই অসংখ্য সূতীক্ষ্ম ধার বর্শা এসে গেঁথে যেতে লাগলো তার চার পাশের মাটিতে।

আশ্চর্য কৌশলে নিজকে বাঁচিয়ে নিতে লাগলো বনহুর। ভাগ্যিস, তখনও ট্রাকের সেই লোকদ্বয় ও নূরী একটু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে এসে পৌঁছেছিলো।

জংলী লোকগুলো তাদের কাউকেই দেখতে পায়নি। কাজেই সকলে একযোগে আক্রমণ করেছে বনহুরকে।

জংলীগণ আরও নিকটে এসে পড়েছে।

একখানা তীক্ষ্ম বর্শা সাঁ করে চলে গেলো বনহুরের কানের পাশ কেটে। আরও দু'খানা এক সঙ্গে ছুটে এলো, বনহুর চট্ করে সরে দাঁড়ালো। বর্শা দুখানা গিয়ে বিদ্ধ হলো পিছনের ট্রাকের গায়ে।

বনহুর এবার দ্রুত হস্তে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে গুলী ছুড়তে শুরু করলো।

বনহুরের গুলীর আঘাতে এক একজন জংলী ভূতলশায়ী হতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য, জংলীরা এতে এতটুকু বিচলিত হলো না, বরং আরও উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

এতোগুলো হিংস্র জংলীর কবলে বনহুর একা, মরিয়া হয়ে সে লড়াই করে চললো।

রিভলভারের গুলী শেষ হতেই একখানা বর্শা তুলে নিলো বনহুর হাতে। কিছুক্ষণ পূর্বে তার বাম বাহুতে দুষ্ট ডাকু হাঙ্গেরুর ছোরা বিদ্ধ হওয়ায় যদিও বেশ কষ্ট পাচ্ছিলো, তবু সে এতটুকু দুর্বল হলো না।

বনহুর জংলীদের বর্শার আঘাত তার হস্তস্থিত বর্শা দিয়ে প্রতিরোধ করে চললো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নিকটস্থ আক্রমণকারী জংলীদের ভূতলশায়ী করতে লাগলো। কেউ বা বনহুরের বর্শার আঘাতে ছিটকে পড়লো নীচে; কেউ বা আহত হলো, কেউ বা হলো নিহত।

বনহুরের অসীম শক্তির কাছে জংলীর দল কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো। কতগুলো জংলী নিহত হলো, কতক আহত অবস্থায় ছুটে পালালো, এমন কি যারা অক্ষত অবস্থায় ছিলো তারা দৌড় দিল উর্দ্ধশ্বাসে, ফিরে তাকালো না আর।

এতগুলো জংলীর সঙ্গে বনহুর একা প্রাণপণে লড়াই করে অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো। ট্রাকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো।

ওদিকে লোক দুটি আর নূরী এতোক্ষণ একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো। এবার জংলীদের পালাতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তারা।

বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

লোক দু'জন বনহুরকে অনেক সহানুভূতিজনক কথা বলতে লাগলো। নূরী আজ স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্না হলে ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়তো বনহুরের বুকে। আজকের এ বিপদ মুহূর্তে বনহুরকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দের সীমা থাকতো না। কিন্তু নূরী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো, একটি কথাও সে বললো না!

বনহুর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললো– আপনারা আর বিলম্ব করবেন না, গাড়িতে উঠে বসুন। তারপর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো সে– নূরী, এসো আমার পাশে।

বনহুরের কথায় নূরী ট্রাকের ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসলো।
আর ব্যবসায়ী লোক দু'জন ট্রাকের পিছনে উঠে বসলো।
বনহুর গাড়ি ষ্টার্ট দিলো।
এই সে জীবনের প্রথম ট্রাক চালকের ভূমিকা গ্রহণ করলো।

❑

পথে আর কোন বিপদ দেখা দিল না।

বনহুর ট্রাক সহ এসে পৌঁছলো ঝাঁম শহরে।

ব্যবসায়ী লোক দুজন বনহুরের দয়ায় নিজেদের জীবন ও তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হলো। নিজেদের বাড়িতে বনহুর আর নূরীকে নিয়ে গেলো তারা অতি সমাদর করে।

লোক দু'জন অত্যন্ত ধনবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিরাট বাড়ি-গাড়ি, শহরের মধ্যে বড় বড় দোকান-পাট অনেক রয়েছে তাদের। ব্যবসায়ী লোক হিসাবে শহরময় তাদের অনেক নাম রয়েছে।

হঠাৎ গত দুদিন আগে ব্যবসায়ীদ্বয় নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় শহরময় একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো। পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলো। কিন্তু এ লোক দুজনার কোন সন্ধান করে উঠতে পারেনি।

ব্যবসায়ীদ্বয়ের বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এমন দিনে আবার ফিরে পেলো তারা তাদের হারানো ধনকে। ব্যবসায়ীদ্বয়ের আত্মীয়-স্বজন সবাই বনহুরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো। শহরের বহু ব্যক্তি এলেন দেখা করতে বনহুরের সঙ্গে।

এদের মধ্যে শহরের এক অভিজ্ঞ ডাক্তারও এলেন, ব্যবসায়ী প্রথম ব্যক্তির বন্ধুলোক তিনি।

ব্যবসায়ীদ্বয়ের প্রথম ব্যক্তির নাম কামরান আলী ও দ্বিতীয় জনের নাম জামশেদ মিয়া, উভয়ে আপন সহোদর ভাই না হলেও তারা উভয়ে উভয়ের পরম আত্মীয়।

অভিজ্ঞ ডাক্তার জামরুদী কামরানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

জামরুদী বনহুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন।

কামরান বনহুরকে নিয়ে একটা ভোজের আয়োজন করলেন, কাজেই দু' এক দিনের জন্য বনহুরকে ঝাঁম শহরে বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হলো।

কথায় কথায় ডাক্তার জামরুদী ও বনহুর অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একথা সে কথায় বনহুর জানতে পারলো– ডাক্তার জামরুদী শুধু ডাক্তারই নন, তিনি মস্তবড় বৈজ্ঞানিক। জীবনে তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন এবং বহু রোগের ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

ডাক্তার জামরুদীর কথায় বনহুরের মনের আকাশে একটা আশার আলো উঁকি দিয়ে গেলো। নূরী আজ জ্ঞান-শূন্যা। যাদুকরের কোন ঔষধ তা স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত করে দিয়েছে।

বনহুর এক সময় ডাক্তার জামরুদীর নিকটে নূরীর সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলে বললো।

বনহুরের কথায় জামরুদী গভীরভাবে কিছু চিন্তা করলেন, তারপর হেসে বললেন তিনি– আমি তাকে দেখতে চাই।

বনহুর সেই মুহূর্তেই নূরীকে ডেকে আনলো ডাক্তার জারুদীর সম্মুখে।

নূরীকে কিছু সময় পরীক্ষা করে জামরুদী বললেন– মিঃ চৌধুরী, আপনি চিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার বোনকে সুস্থ করে দেবো। আবার সে স্বাভাবিক জ্ঞান শক্তি ফিরে পাবে।

বনহুর নিজের নাম মিঃ ইউসুফ চৌধুরী ও নূরীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলো এখানে। সত্যি পরিচয় দিলে বনহুরকে তারা নিশ্চয়ই সুনজরে দেখবে না, কাজেই তাকে এই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। ডাক্তারের কথায় বনহুর খুশি হলো। মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ জানালো বনহুর।

কামরান আলী ও জমশেদ মিয়ার বাড়িতে বনহুর আতিথ্য গ্রহণ করবার পর বিদায় নিয়ে ডাক্তার জামরুদীর বাড়িতে গেলো। জামরুদী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বনহুর আর নূরীকে নিজ আবাসে নিয়ে রাখলেন।

নূরীর চিকিৎসা করবেন স্বয়ং জামরুদী।

যেদিন নূরীকে জামরুদী নিজের চেম্বারে নিয়ে গেলেন– সঙ্গে বনহুর।

জামরুদী বললেন– মিঃ ইউসুফ, আপনার বোনকে আমি এমন একটা ঔষধ সেবন করাবো, যে ঔষধ সেবনের পর আপনার বোন সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে কয়েক দিন আমি রাখবো।

বনহুরের মনে একটা দুশ্চিন্তার ঝড় বইলেও সে বিচলিত হলো না। কারণ, একদিনে ডাক্তার জামরুদীকে চিনতে বাকী রাখেনি বনহুর। লোকটা

মহৎ এবং নিষ্ঠাবান তাতে কোন ভুল নেই। বয়স তার পঞ্চাশের বেশি হবে, ধীর-স্থির সৌম-সুন্দর পুরুষ। ডাক্তার জামরুদীকে কথা দিলো বনহুর, তিনি যে ভাবে নূরীকে সুস্থ করতে চান তাতেই রাজি আছে সে।

বনহুর আর নূরী এসে বসলো ডাক্তার জামরুদীর চেম্বারে। কক্ষটা খুব প্রশস্ত নয়, মাঝারি গোছের। কক্ষের চারদিকে আলমারী আর টেবিল সাজানো। প্রত্যেকটা আলমারীতে নানাবিধ শিশি সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে। সবগুলো শিশিতে তরল পদার্থ। টেবিলে নানারকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থরে থরে সাজানো রয়েছে। এক পাশে একটি রবারের শয্যা পাতা রয়েছে।

এ শয্যায় রোগিগণকে শোয়ানো হয়।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

হেসে বললেন ডাক্তার জামরুদী, খুব বিস্ময় লাগছে আমার এ সব দেখে, না?

হাঁ, সত্যি আমি অবাক হচ্ছি ডক্টর, ইতিপূর্বে আমি কোন বৈজ্ঞানিকের চেম্বারে প্রবেশ করিনি।

ডাক্তার জামরুদী বললেন– ইতিপূর্বে আমার চেম্বারেও কোন বাইরের আগন্তুক প্রবেশে সক্ষম হয় নি মিঃ চৌধুরী, আপনিই সর্ব প্রথম ....

তাহলে আপনি আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেছেন?

হাঁ, আপনার কথাবার্তা ও ব্যবহারে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। আমি রোগির কোন আত্মীয়কে আমার চেম্বারে প্রবেশে অনুমতি দেই না।

ডাক্তার জামরুদী কথা শেষ করে পাশের দরজার পর্দা ঠেলে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কে জানে।

বনহুর আর নূরী দুটি আসনে বসে রইলো চুপচাপ।

বনহুরের বিস্ময় তখনও কমেনি, সে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো সব।

নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো এদিকে ওদিকে।

বনহুর বললো– নূরী, জানো এখানে কেনো এসেছি?

নূরী মাথা দোলালো, বললো–জানি, আমার চিকিৎসার জন্য!

কি করে বুঝলে তোমার চিকিৎসার জন্য?

ডাক্তারের কথা আমি কি বুঝতে পারিনি ভাবছেন?

নূরী, এসব যদি বুঝতে পারো, তবে আমার মনের ব্যথা কেনো বুঝতে পারো না? আজও কেনো তবে আমাকে চিনতে পারো না?

নূরী মাথা নাড়লো, কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারছে না। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো।

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাত মুঠায় চেপে ধরলো– নূরী, তোমাকে ডাক্তার কয়েক দিনের জন্য.....

কথা শেষ হয় না বনহুরের, কক্ষে প্রবেশ করেন ডাক্তার জামরুদী– মিঃ চৌধুরী, আসুন, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা নিভৃতে কথা আছে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো– বসো তুমি, এক্ষুণি আসছি। ডাক্তার জামরুদীকে অনুসরণ করলো বনহুর।

পাশের কামরায় প্রবেশ করে বনহুর আরও বিস্মিত হলো! সমস্ত কক্ষটা গাঢ় রক্তাভ আলোকে আলোকিত।

মনে হলো সমস্ত কক্ষটায় রক্ত ছড়িয়ে আছে। এ কক্ষে পূর্বের কক্ষের চেয়ে অনেক বেশি শিশি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। নানা রকম জার ও কাঁচপাত্র ঔষধপূর্ণ। রক্তাভ আলোতে কাঁচ পাত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো কেমন যেন লাল টক্ টকে দেখাচ্ছে।

বনহুরকে বসতে বললেন ডাক্তার জামরুদী।

বনহুর ডাক্তারের কথা অনুযায়ী আসন গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা আশঙ্কা দোলা জাগালো। কক্ষটার মধ্যে একটা উৎকট ঔষধের গন্ধ ছড়িয়ে ছিলো। বনহুরের যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো।

ডাক্তার জামরুদী সম্মুখের কাঁচের টেবিলে একটি কাঁচ পাত্রে গাঢ় সবুজ রং এর ঔষধ রেখে পরীক্ষা করছিলেন। সবুজ তরল ঔষধটার উপরে লাল আলো কেমন যেন কালো রঙ এর সৃষ্টি করছিলো। বললো জামরুদী– মিঃ চৌধুরী, আপনিও ঘাবড়ে গেছেন?

ব্যস্তভাবে বলে উঠলো বনহুর – না না, আপনি ভুলে বুঝছেন ডক্টর।

ডাক্তার জামরুদী বনহুরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন– দেখুন মিঃ চৌধুরী, আমি আপনার বোনের উপর এখনই ঔষধ প্রয়োগ করবো, এবং আপনার সাক্ষাতে করবো।

ধন্যবাদ ডক্টর।

এই আমার জীবনে প্রথম কোন আত্মীয়ের সম্মুখে রোগিকে তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে বিলুপ্ত করা। আপনি কোন রকম বিচলিত হবেন না তো ?

হাসলো বনহুর– আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ডক্টর।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ চৌধুরী, যান, আপনার ভগ্নিকে নিয়ে আসুন এ কক্ষে।

বনহুর চলে গেলো। একটু পরে ফিরে এলো নূরী সহ।

এ কক্ষে প্রবেশ করে নূরী বেশ ঘাবড়ে গেলো। কক্ষটা সত্যি অত্যন্ত ভীতিকর ছিলো।

বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো নূরী– আমাকে আপনারা হত্যা করবেন না তো?

বনহুর হেসে বললো– উনি দস্যু বা ডাকু নন যে, তোমাকে হত্যা করবেন।

বনহুরের কথায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডাক্তার জামরুদী– চৌধুরী, আপনি ভুল করছেন, কারণ দস্যু বা ডাকু হলেই তারা বিনা কারণে হত্যা করে না।

আপনিই ভুল করছেন ডক্টর, দস্যু বা ডাকুদের হত্যা করা একটা নেশা।

ওকথা আপনি জানেন না বলেই বলছেন মিঃ চৌধুরী, দস্যু বনহুরের কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

হাঁ, শুনেছি তার নাম। বললো বনহুর।

ডাক্তার জামরুদী বললেন– দস্যু হলেও সে এক মহান ব্যক্তি। যদিও তাকে কোনদিন চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু তার নাম আমি অন্তরে গেথে রেখেছি।

ডক্টর!

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি! দস্যু হলেও সে মানুষ, কিন্তু আজ শত শত মানুষরূপী ব্যক্তি, যারা সমাজের বুকে স্বনামধন্য হয়ে জেকে বসে আছেন, তারা দস্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর.........

ডক্টর, আপনার অন্তরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পৃথিবীতে এমন জনও আছে, যারা মানুষের নকল রূপের পিছনে আসল রূপটা দেখতে পায়।

জামরুদী দস্যু বনহুরের কথায় বেশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন, তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকভাবে কণ্ঠে বললেন– ও ঃ এবার কাজ শুরু করবো।

বনহুর নূরীর দিকে তাকালো– ভয় নেই, আমি আছি নূরী।

ডাক্তার জামরুদী নূরীকে নিয়ে একটি সোফায় বসালেন। সোফার চারদিকে কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ ছিলো। পাশেই একটা রবারের শয্যা।

জামরুদী সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটা গাঢ় লালে ভরে উঠলো। নূরীকে দেখে মনে হলো– তার সমস্ত দেহে কে যেন একপোঁচ রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে। বনহুর নূরীর অদূরে এসে দাঁড়ালো। চোখে-মুখে তার একটা ভীতির ভাব ফুটে উঠলো, আজ তার নিজের এ অবস্থা হলে এতোটুকু ঘাবড়ে যেতোনা সে। কিন্তু নূরীর জন্য আশঙ্কা– যদি নূরীর জ্ঞান আর ফিরে না আসে।

ডাক্তার জামরুদী টেবিল থেকে সবুজ তরল পদার্থ সহ কাঁচপাত্রটা হাতে উঠিয়ে নিলেন।

বনহুর তাকিয়ে আছে নির্বাক নয়নে নূরীর মুখের দিকে।

ডাক্তার জামরুদী কাঁচ-পাত্রটা নূরীর মুখের কাছে নিয়ে এলেন।

নূরী নিঃশব্দে পান করল তরল সবুজ পদার্থটুকু।

জামরুদী এবার দ্রুত হস্তে কাঁচ-পাত্র টেবিলে রেখে নূরীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বনহুর তাকিয়ে আছে তখনও নূরীর দিকে অপলক নয়নে। ধীরে ধীরে নূরীর চোখ দুটো যেন মুদে আসছে।

মাথাটা নুয়ে আসছে সম্মুখের দিকে।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে..... হঠাৎ বনহুর নূরীকে ডাকতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে জামরুদী ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বারণ করল তাকে কথা বলতে।

নূরী টলে পড়ে যাচ্ছিলো, জামরুদীর ইংগিতে নূরীকে ধরে ফেললো বনহুর। তুলে নিলো সে নূরীর ছিন্ন লতার মত সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপর।

ডাক্তার জামরুদী এবার কথা বললেন– ঐ বিছানায় শুইয়ে দিন।

বনহুর নূরীকে ওপাশের রবারের বিছানায় শুইয়ে দিলো ধীরে ধীরে। তারপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো শিয়রে।

ডাক্তার জামরুদী বললেন– আজ থেকে পরশু পর্যন্ত অজ্ঞান থাকবে। তারপর চতুর্থ দিনে জ্ঞান ফিরে আসবে। মিঃ চৌধুরী ঐ দিন আপনার ভগ্নি আপনাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

ডক্টর, আপনার দয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

প্রবল আগ্রহ নিয়ে বনহুর নূরীর পাশে বসে আছে। তাকিয়ে আছে সে তার মুদিত আঁখি দুটির দিকে।

❑

আজ চতুর্থ দিন।

কক্ষে যে গাঢ় লাল আলো জ্বলছিলো, প্রতি দিন একটি করে সুইচ টিপে এক একটি আলো নিভিয়ে দিচ্ছিলেন ডাক্তার জামরুদী। আজ শেষ বাল্‌বের সুইচ টিপলেন ডাক্তার।

কক্ষমধ্যে আজ কোন লাল রঙের আলো নেই।

একটা উজ্জ্বল আলো কক্ষটিকে আলোকিত করে রেখেছিলো। এতদিন কক্ষটা গভীর আলোতে আলোকিত থাকায় বনহুরের চোখে ধাধা লেগে গিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে বাইরে গিয়েছে বনহুর আহার ও স্নানের জন্য। কিন্তু সর্বক্ষণ সে নূরীর শয্যার পাশ থেকে সরে যায়নি। কোন কোন সময় ডাক্তার জামরুদীর অন্দরে পাশের চেম্বারে একটু বিশ্রাম করে নিয়েছে সে, কিন্তু ঘুম তার চোখে আসেনি। নানা দুশ্চিন্তায় মনটা সর্বক্ষণ ভরে থাকতো। নূরীকে বনহুর শুধু ভালই বাসেনা নূরী বনহুরের একজন জীবন-সঙ্গিনী।

নূরীর অমঙ্গল আশঙ্কা বনহুরকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো। কখন জ্ঞান ফিরে আসবে কে জানে– ফিরবে কি না তাইবা কে বলতে পারে।

আজ চতুর্থ দিবস। নূরীর শিয়রে বসে উত্তেজিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে বনহুর।

ডাক্তার জামরুদীও উন্মুখ হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছেন, একটা কি যেন ঔষধ সহ পাইপ ধরে আছেন নূরীর নাকের কাছে। মাঝে মাঝে নার্ভ পরীক্ষা করে দেখছেন তিনি।

চতুর্থ দিনও প্রায় শেষ হয়ে এলো।

ডাক্তার জামরুদীর ললাট কুঞ্চিত হলো, মুখভাবে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তার ছাপ। কেমন যেন বিহ্বল মনে হচ্ছে তাকে।

বনহুর বুঝতে পারলো– নূরীর জীবন আশঙ্কাজনক। ডাক্তার জামরুদীর মুখভাব লক্ষ্য করে বনহুরের মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু হলো। তাহলে নূরীকে ও হারালো এবার।

ক্রমেই বনহুরের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। একটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এ মুহূর্তে ডাক্তার জামরুদীকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারে। বনহুর তবু ধৈর্য সহকারে বললো—ডক্টর, কেমন দেখছেন?

জামরুদী বললেন– আমি ইতিপূর্বে আরও অনেকগুলো এ ধরণের কেস সুস্থ্য করেছি, কিন্তু --- থেমে যান ডাক্তার জমরুদী।

বনহুর ডাক্তারের কলার চেপে ধরলো– থামলেন কেনো বলুন? বলুন ডক্টর, নূরীর জ্ঞান ফিরবে তো?

ডাক্তার জমারুদী বলে উঠেন– হাঁ হাঁ ফিরবে---- কিন্তু ------কিন্তু

কিন্তু কি? বলুন, বলুন ডাক্তার?

এমন তো কোনদিন হয়নি!

কি বলছেন! বনহুর যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তার জামরুদীর ললাটে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ মণ্ডল অন্ধকার হলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন তিনি– পারলাম না মিঃ চৌধুরী .....

জামরুদীর কথা শেষ হতে না হতে গর্জে উঠলো বনহুরের হাতের রিভলভার।

একটা আর্তনাদ করে ডাক্তার জামরুদী পড়ে গেলেন তার ল্যাবরেটরীর মেঝেতে। জামরুদীর বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো ল্যাবরেটরীর মেঝের কার্পেট।

বনহুর রিভলভার পকেটে রেখে ফিরে তাকালো শয্যায় শায়িত নূরীর দিকে। নূরীর মুদিত আঁখি কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু মুক্তা বিন্দুর মত চক্ চক্ করছে।

বনহুর নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলো না। নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বালকের ন্যায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাবরেটরীর বাইরে শোনা গেলো দ্রুত পদ শব্দ। রিভলভারের গুলীর শব্দ বাইরে গিয়ে পৌছেছে, তারই শব্দে ছুটে আসছে ডাক্তার জামরুদীর কর্মচারীগণ।

বনহুর একবার তাকালো ল্যাবরেটরীর পিছন শার্শির দিকে। ক্ষিপ্র হস্তে খুলে ফেললো পিছন শার্শিটা।

পুনরায় ফিরে এলো নূরীর শয্যার পাশে।

ল্যাবরেটরীর বাইরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে কেউ ডাকছে– স্যার, স্যার কি হলো? স্যার.........

বাইরে এসে সবাই জড়ো হয়েছে কিন্তু ল্যাবরেটরীর ভিতরে প্রবেশের কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বনহুর হাতের উপর তুলে নিলো নূরীর মৃতবৎ দেহটা। এক বার তাকালো ভূলুণ্ঠিত ডাক্তার জমরুদীর রক্ত মাখা দেহটার দিকে।

জামরুদীর মুখে এখনও গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। রোগিকে হত্যার করার অভিপ্রায় তাঁর ছিলো না, তিনি চেয়েছিলেন রোগিকে নতুন জীবন দান করতে।

বনহুর নূরীর এলিয়ে পড়া দেহটা নিয়ে পিছন শার্শি দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বাইরে।

নির্জন নদীর তীর।

নূরীর নিস্তব্ধ দেহটার পাশে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বনহুর। গোটা রাত এমনি ভাবে কেটে গেছে বনহুরের, একবারও সে নূরীর দেহের পাশ থেকে সরে যায়নি কোথাও। সত্যি কি নূরী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য চলে গেলো? কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয়না বনহুরের। কত বার নূরীর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেছে সে, মনে হয়েছে অতি ধীরে মৃধু ভাবে নিশ্বাস বইছে। একটা ক্ষীণ আশা এখনও ত্যাগ করতে পারেনি বনহুর। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে ব্যাকুল আঁখি মেলে নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ভোরের হাওয়া বইছে।

পূর্ব আকাশ রাঙা করে উঁকি দিলো অরুণ আলো। গোটা বিশ্ব নতুন জীবন লাভ করলো যেন।

বনহুর নির্ণিমেষ নয়নে তাকালো নূরীর স্থির-নিশ্চল মুখমণ্ডলের দিকে। গাছে গাছে পাখির কলরব জেগে উঠলো। নদীর কূল কূল ধ্বনির সঙ্গে ভেসে এলো ভোরের আযানের শব্দ।

হঠাৎ বনহুরের চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব আনন্দ উচ্ছ্বাস। নূরী ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো।

বনহুর ব্যাকুল আগ্রহে ঝুঁকে পড়লো নূরীর মুখের কাছে। গভীর আবেগে ডাকলো– নূরী! নূরী!

নূরীর সমস্ত দেহটা নড়ে উঠলো, হাতখানা উঁচু করতে গিয়ে আবার পড়ে গেলো এক পাশে।

বনহুর হাতখানা ধরে ফেললো হাতের মুঠোয় পুনরায় ডাকলো– নূরী।

নূরীর ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠলো, অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো– পানি।

বনহুর ব্যস্তভাবে নদীর দিকে এগিয়ে গেলো, দু'হাতে খানিকটা পানি নিয়ে দ্রুত ফিরে এলো নূরীর পাশে।

হাটু গেড়ে বসে পানিটুকু নূরীর মুখে দিলো।

এতোক্ষণে নূরীর গলা কিছুটা যেন ভিজে শব্দ বেরিয়ে এলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো– আমি কোথায়?

বনহুর নূরীর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে বললো– তুমি আমার পাশে, নূরী।

নূরী দু'হাতে চোখ দুটো একবার মুছে নিলো– আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, তুমি ....তুমি.......

বলো, বলো....... বলো নূরী?

তুমি আমার হুর .... হুর........

বনহুর উচ্ছ্বাসিত আনন্দে নূরীকে ভূতল থেকে তুলে নেয় হাতের উপর, আকুলভাবে বলে সে –নূরী আমি, আমি তোমার বনহুর!

নূরী ক্ষীণকণ্ঠে বললো– আমি কেনো তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা হুর?

জানিনা, জানিনা নূরী কেনো, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না!

নূরী, দু'হাতে চোখ রগড়ে ভাল করে তাকালো– আমার চোখে পানি দাও! পানি দাও!

বনহুর আবার নূরীকে নদী তীরস্থ দূর্বাকোমল শয্যায় শুইয়ে দিয়ে পানি আনতে ছুটলো। এবার রুমাল ভিজিয়ে পানি নিয়ে এলো সে। নূরীর চোখ মুখে পানির ছিটা দিতে লাগলো।

নূরী এবার তাকালো মুক্ত আকাশের দিকে। আজ নূরী নব জীবন লাভ করলো। আকাশের নীল রঙ তার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুললো। নূরী তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। মুহূর্তে নূরীর চোখে-মুখে এক খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো। দু'হাত বাড়িয়ে দিলো বনহুরের দিকে– বনহুর তুমি.... তুমি......

বনহুর গলাটা এগিয়ে দিলো নূরীর দিকে, নিজের হাত দু'খানা দিয়ে নূরীর অবশ হাত দু'খানা তুলে নিলো।

নব জীবন লাভ করলো নূরী। বহুদিন পর আজ প্রথম বনহুরের নাম ধরে ডাকলো আর চিনতে পারলো তাকে।

বনহুর এতো খুশি হয়েও ব্যথায় মুষড়ে পড়লো, ভুল করে সে ডাক্তার জামরুদীকে হত্যা করেছে। ভুল শুধু বনহুরেরই হয়নি, ভুল করেছিলো জামরুদীও–তার ঔষধ তিন দিনের স্থানে চার দিন সময় নিয়েছিলো, কারণ ঔষধের মাত্রা সামান্য একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো সেবনকালে। এবং সে জন্যই নূরীর সংজ্ঞালাভে বিলম্ব ঘটেছিলো। ডাক্তার জামরুদী হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, মনের দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলো বনহুরের নিকটে।

বনহুরের ধৈর্যের বাধ ভেংগে গিয়েছিলো সে মুহূর্তে। জামরুদী ইচ্ছা করেই তার নূরীকে হত্যা করেছে মনে হয়েছিলো তার। তাই বনহুর হত্যা করেছিলো ডাক্তার জামরুদীকে।

এখানে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ব্যথায় বনহুরের অন্তর জর্জ্জরিত হলো।

নূরী তখন বনহুরের মুখে-মাথায়-গলায় হাত বুলিয়ে গভীরভাবে অনুভব করছিলো, সত্যি তার বনহুর ফিরে এসেছে কিনা তার পাশে।

বনহুর অশ্রু ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখছিলো নূরীকে। কত দিনের প্রতীক্ষার পর আজ যেন সে তার আকাঙ্খিত জিনিসটিকে খুঁজে পেয়েছে।

বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে টেনে নিলো কাছে। আবেগভরা কণ্ঠে বললো– নূরী!

বলো?

তুমি কি হয়ে গিয়েছিলে নূরী? কেন তুমি অমন হয়ে গিয়েছিলে? কেনো এতোদিন তুমি আমায় হুর বলে ডাকোনি?

আমি তো এ সব কিছুই জানিনা। আমি কি ছিলাম তোমার পাশে?

হাঁ নূরী, কিন্তু পাশে থেকেও তুমি ছিলে অনেক দূরে। কোন দিন আমি তোমার নাগাল পাইনি।

বনহুর, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু আমার মনি–মনি কই? ওকে কোথায় রেখেছো? ব্যাকুল কণ্ঠে নূরী বনহুরকে প্রশ্ন করে বসলো।

হঠাৎ নূরীর প্রশ্নের জবাব দিয়ে উঠতে পারলো না বনহুর। কেমন যেন থ' মেরে গেলো। একটু চিন্তা করে বললো সে– মনি আছে।

কোথায়? কোথায় সে বলো?

বনহুর এবার বিপদে পড়লো, মনি কোথায় সে-ই জানেনা। বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে। কিন্তু হঠাৎ এখন 'মনি নেই' কথাটা বলা ঠিক হবে না নূরীর কাছে। হয়তো আবার তার মস্তিষ্কে কোন গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। ভয় হলো বনহুরের, একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো– দেখছো না এটা অন্য দেশ? তোমার মনি আস্তানায় আছে।

আনন্দভরা কণ্ঠে বললো নূরী– সত্যি বলছো তো?

হাঁ– হাঁ, নূরী।

বনহুর, আমাকে নিয়ে চলো, আর বিলম্ব সইছে না' কখন আমি মনিকে বুকে পাবো। চলো চলো হুর..........

চলো।

বনহুর আর নূরী উঠে দাঁড়ালো।

নূরীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, কাজেই বনহুর নূরী সহ একটি বড় হোটেলে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলো। শহরের সবচেয়ে সেরা এবং উৎকৃষ্ট হোটেল-বনহুর ও নূরীর কোন অসুবিধা হলো না এখানে। নানা রকম ফল-মূল ও ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করে দিলো বনহুর নূরীর জন্য।

নূরীকে নিয়ে মাঝে মাঝে বনহুর শহর ভ্রমণে বের হতো। কখনও পার্কে বা লেকের ধারে গিয়ে বসতো।

কিন্তু এতো করেও নূরীর মনে বনহুর শান্তি আনতে পারলো না। নূরী সব সময় মনির জন্য ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। নূরীর মুখের হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

বনহুর আবার নূরীর জন্য চিন্তিত হলো। কোথায় মনি কে জানে– আর কি তাকে কোন দিন ফিরে পাবে। অসম্ভব সে আশা– নূরীর জন্য বনহুর বেশ আশঙ্কিত হয়ে পড়লো। এখন মিছেমিছি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাখছে– মনি তাদের আস্তানায় আছে, কিন্তু আস্তানায় ফিরে যখন নূরী মনিকে খুঁজে পাবেনা, তখন কি বলবে বনহুর তাকে?

বনহুরও চিন্তিত হয়ে পড়লো, এখানে মিথ্যা বলে নূরীকে ভুলিয়ে রাখলেও কান্দাই পৌছে তাকে কিছুতেই মিথ্যা ছলনায় ভুলানো যাবে না।

❑

সেদিন হোটেলের ক্যাবিনে নিজের বিছানায় বনহুর আপন মনে চিন্তা করছিলো।

নূরী এসে দাঁড়ালো তার পাশে, বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল চালাতে চালাতে বললো– হুর, আর আমি থাকতে পারছিনা।

বনহুর একটু হেসে বললো– কেনো?

নূরী এবার বসে পড়লো বনহুরের পাশে– মনিকে না দেখে।

ওঃ এই কথা! আচ্ছা নূরী!

বলো?

মনিকে তুমি বেশি ভালবাসো, না আমাকে?

নূরী গম্ভীর কণ্ঠে বললো– এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য?

দেখো নূরী, মনিকে তোমার ছাড়তে হবে, নয় আমাকে......

কি বললে? নূরী যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

বনহুর কথাটা বলে ভুল করছে বুঝতে পারলো। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বললো– নূরী, তোমার মন বুঝলাম। তুমি কান্দাই পৌছেই তোমার মনিকে পাবে।

নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে। স্নেহ ভরা কণ্ঠে বললো– নূরী, এতো অল্পে তুমি ভেংগে পড়ো, কই আগে তো এমন ছিলেনা?

বনহুরের প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে বললো নূরী– আর কোন দিন তুমি ওরকম প্রশ্ন আমাকে করোনা।

না, আর করবো না, কথা দিলাম তোমাকে।

নূরীর চোখের পানি হাত দিয়ে মুছে দিলো বনহুর, বললো– যাও, তৈরি হয়ে নাও নূরী, আজই আমরা কান্দাই এর পথে রওয়ানা হবো।

খুশিতে নূরীর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো– সত্যি বলছো?

হাঁ।

নূরী আনন্দে মেতে উঠে, ছুটে চলে যায় সে নিজের কামরায়।

ঝাম শহর থেকে প্লেনযোগে কান্দাই পৌছানো যায়। বনহুর প্লেনের দু'খানা টিকিট কেটে নিলো। কত দিন পর বনহুর আর নূরী কান্দাই ফিরে চলেছে– কত আনন্দ হবার কথা, কিন্তু বনহুরের মনে পূর্বের সে আনন্দ নেই। নূরীকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়েছে সে– মনিকে কান্দাইয়ে তাদের আস্তানায় গিয়েই দেখতে পাবে। সে সান্ত্বনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বনহুর ভিতরে ভিতরে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

মেঘের বুক চিরে প্লেনখানা এগিয়ে চলেছে। পাশ কেটে ভেসে যাচ্ছে পেঁজা তুলার মত খণ্ড খণ্ড মেঘের স্তূপগুলো। বনহুর নিজের আসনে বসে তাকিয়ে ছিলো পাশের শার্শী দিয়ে নীচের দিকে।

খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁকে পৃথিবীটাকে ঠিক ছবির মতই মনে হচ্ছিলো। ছোটবড় দালান-কোঠা আর নদী-নালাগুলো যেন রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতই মনে হচ্ছিলো।

নূরী বসেছিলো বনহুরের পাশে। প্লেনে সে কোনদিন উঠে নি, বিস্ময় জাগছিলো তার মনে। অবাক হয়ে সব দেখছিলো নূরী।

বোয়িং বিমান এটা।

অগণিত যাত্রী নিজ নিজ আসন দখল করে নিয়ে বসে আছে।

বনহুরের সম্মুখ আসনে বসে ছিলে কয়েকজন মহিলা, একটি যুবতিও ছিলো বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে। যুবতীর শরীরে আধুনিক আটসাট পোশাক।

যুবতী বার বার বনহুরের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছিলো।

বনহুরের চোখ দুটো শার্শির ফাঁকে নিবদ্ধ থাকলেও যুবতীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। মনে মনে হাসলো বনহুর। যুবতীর কণ্ঠে একটা মূল্যবান লকেট জ্বলজ্বল করছে।

বনহুরের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো, ঐ মূল্যবান লকেটখানা তার চাই।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো বনহুর।

প্লেনখানা তখন মেঘের মধ্য দিয়ে বাম্পিং করে এগোচ্ছিলো।

একটা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো প্লেনখানা।

বনহুর সিগারেটের ধুম্ররাশির ফাঁকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো যুবতীটিকে।

যুবতীটিও তাকাচ্ছিলো বার বার বনহুরের দিকে।

দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিলো বনহুর আর যুবতীর মধ্যে।

যুবতীর হৃদয়ে এক অপলক আনন্দের লহরী দোলা জাগাচ্ছিলো।

এক সময় বোয়িং কান্দাই শহরের আকাশে এসে পৌঁছলো। বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো– কতদিন পর কান্দাইয়ের হাওয়া গ্রহণ করলাম, নূরী।

নূরীর চোখে আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠেছে।

যুবতী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেই বসলো– আপনি কি কান্দাইয়ে নামবেন?

বনহুর হেসে জবাব দিলো– হাঁ, কান্দাই আমার গন্তব্য স্থান।

যুবতী প্রফুল্ল কণ্ঠে বললো– কান্দাই আমিও নামবো।

যুবতীর গায়ে পড়ে আলাপ ভালো লাগলো না নূরীর। যুবতী পুনরায় বলে উঠলো– ওনি বুঝি আপনার......

আমার আত্মীয়া।

ও ঃ যুবতীর বুক থেকে একটা জমাট অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গেলো। যুবতী নিজেই বলে উঠলো– গুলবাগ হোটেলের মালিক আমার আব্বা। আসবেন একদিন গুলবাগে, দেখা হবে আমার সঙ্গে।

বনহুর বললো– মহব্বৎ আলী আপনার আব্বা?

হাঁ, ফুলবাগের পাশেই আমাদের বাড়ি।

যুবতী যখন বনহুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত, তখন মাইকে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেলো– আপনারা নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসুন এবং বেল্ট বেধে নিন। কান্দাই এরোড্রামে এসে গেছি আমরা।

প্লেনের যাত্রীগণ আসনের সঙ্গে নিজ নিজ বেল্ট বেধে নিলো।

কান্দাই এরোড্রামের উপরে চক্রাকারে উড়ে বেড়াতে লাগলো প্লেনখানা।

আশায় আনন্দে উৎফুল্ল সমস্ত যাত্রীগণ।

এক সময় রানওয়েতে প্লেন অবতরণ করলো।

এরোড্রামে উন্মুখ জনতা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। যার যার আত্মীয়-স্বজন এসেছে তাদের রিসিভ্ করে নিতে।

প্লেন এসে এরোড্রামে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

সিড়ি বেয়ে নেমে আসছে যাত্রীগণ।

যুবতী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো- নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবেন?

হেসে বললো বনহুর- নিশ্চয়ই।

একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে যাত্রীগণ প্লেন থেকে অবতরণ করছে।

যুবতী ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে পড়লো, বনহুরের পাশে গা ঘেষে সিড়ি বেয়ে নামতে লাগলো।

বনহুর এ সময়টুকুর প্রতীক্ষাতেই ছিলো।

আলগোছে কখন যুবতীর কণ্ঠ থেকে মূল্যবান লকেটখানা বনহুরের পকেটে গিয়ে পৌঁছলো।

বনহুর আর নূরী যুবতীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলো এরোড্রাম থেকে।

যুবতী এগিয়ে গেলো তার আত্মীয়-স্বজনের দিকে।

অনেকেই এসেছে যুবতী পারভিনকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। তার পিতা মহব্বৎ আলীও এসেছেন।

কন্যাকে দেখেই এগিয়ে গেলেন মহব্বৎ আলী- হ্যালো পারভিন, প্লেনে কোন কষ্ট হয়নি তো?

না আব্বা, কোন কষ্ট হয়নি।

মহব্বৎ আলী বললেন- তোমার লকেটটা খুলে রেখেছো কেনো মা?

লকেট! অস্ফুট ধবনি করে নিজের গলায় তাকালো পারভিন। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো- আমার লকেট গেলো কোথায়?

এখানে যখন মহব্বৎ আলী এবং পারভিন লকেট খোঁজা নিয়ে তোলপাড় শুরু করলো, বনহুর আর নূরী তখন ট্যাক্সিতে চেপে বসেছে।

কান্দাই এর একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো বনহুর ও নূরী।

বনহুর জানে, দিনের আলোতে কান্দাই শহরে সে নিরাপদ নয়।

কান্দাই এর পুলিশ মহলের অনেকেই দস্যু বনহুরের আসল রূপ দেখেছেন"। তারা অতি সহজেই বনহুরকে চিনে নিতে পারবেন।

রাতের অন্ধকারে নূরীকে আস্তানায় নিয়ে যেতে হবে।

নূরী কিন্তু অস্থির হয়ে পড়লো, মনিকে দেখার জন্য ভীষণ ভাবে ছট্‌ফট করতে লাগলো।

বনহুর কান্দাই পৌঁছে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলো না। আস্তানায় গিয়ে কি জবাব দেবে নূরীকে যখন নূরী তার মনিকে চাইবে?

❑

কান্দাই শহরে সাড়া পড়ে গেছে- 'মতি মহল' সিনেমা হলে আজ মহা সমারোহে মুক্তিলাভ করবে নতুন ছবি "কুন্তিবাঈ"। দেয়ালে দেয়ালে, দোকান-পাটে, গাড়িতে "কুন্তিবাঈ" ছবির পোষ্টার লাগানো হয়েছে।

বছরের সেরা ছবি 'কুন্তি বাঈ'।

ছবি এসেছে দূর দেশ থেকে শুধু কান্দাই শহরেই নয়, আরও কয়েকটি শহরেও এক সঙ্গে মুক্তি লাভ করছে ছবিটা।

সেদিন মনিরা নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলো, অদূরে একটা ছোট্ট গাড়ি নিয়ে খেলা করছিলো নূর।

এমন সময় নকিব কক্ষে প্রবেশ করে- আপামনি!

বই থেকে চোখ না তুলেই বলে মনিরা- কিছু বলবি?

নকিবের হাতে একটা বিজ্ঞপ্তি, বলল নকিব- আপামনি, দেখুন মতি মহল ছবিঘরে নতুন একটা ছবি এসেছে। শুনলাম, ছবিটা নাকি খুব ভাল। নায়কটা কিন্তু ঠিক আমাদের দাদা মনির মত।

কথাটা শুনে মনিরা চোখ তুলে তাকালো নকিবের দিকে।

নকিব এগিয়ে গিয়ে বিজ্ঞপ্তিটা তুলে দিলো মনিরার হাতে- সত্য করে বলছি আপামনি, দেখুন নিজের চোখে।

মনিরা নকিবের হাত থেকে বিজ্ঞপ্তি নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে। পাশা-পাশি দু'খানা মুখ হিরো আর হিরোইনের। একি? এ যে তার স্বামীর চেহারা! না না, ভুল নেই- ঠিক সেই নাক-মুখ সব। মনিরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে বিজ্ঞপ্তিখানার দিকে।

নকিব মনিরার মনোভাব বুঝতে পেরে বললো- তাইতো আমি বিজ্ঞপ্তিটা পথের একটা ছেলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এলাম।

মনিরার চোখের সম্মুখে তখন স্বামীর মুখখানা ভাসছে। অনেক দিন স্বামীর কোন সন্ধান না পেয়ে মুষড়ে পড়েছিলো মনিরা। আজ আবার নতুন করে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো স্বামীর স্মৃতি।

মনিরা বই রেখে বিজ্ঞপ্তি হাতে উঠে দাঁড়ালো, কি যেন চিন্তা করে বললো নকিব, সরকার সাহেবকে পাঠিয়ে দে। আমি মামীমার ঘরে রয়েছি।

নকিব চলে গেলো, মনিরা বিজ্ঞপ্তিটা আবার মেলে ধরলো চোখের সামনে, নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মানুষের মত কত মানুষ আছে, কিন্তু তার মন এমন করছে কেনো! মামীমাকে এ বিজ্ঞপ্তি দেখাবে না– বলবে না এ সম্বন্ধে কোন কথা। ছবি দেখতে নিয়ে যাবে তাঁকে, হাজার হলেও মা আর সন্তান। যদি সত্যিই সে হয়, তাহলে মায়ের চোখে ধরা না পড়ে যাবে না। যত লোকেরই ভুল হোক, মায়ের কোন দিন ভুল হবে না সন্তানকে চিনতে।

মনিরাকে একটা কাগজ তন্ময় হয়ে দেখতে দেখে গাড়ি রেখে ছুটে এলো নূর, বললো– আম্মা, কি দেখছো অমন করে?

কিছু না বাবা, কিছু না। তাড়াতাড়ি বিজ্ঞপ্তিটা লুকিয়ে ফেললো মনিরা জামার ফাঁকে। তারপর নূরকে কোলে তুলে নিয়ে বললো মনিরা– বাপু, ছবি দেখতে যাবে? সিনেমা?

ইতিপূর্বে একদিন মনিরা নূরকে নিয়ে মতি মহল হলে ছবি দেখতে গিয়েছিলো। নূর তাই কিছুটা পরিচিত হলো সিনেমা সম্বন্ধে। বললো নূর– দাবো আম্মা। আমি দাবো, সত্য নিয়ে দাবে তো আমাকে?

হাঁ বাবা, নিয়ে যাবো।

তারপর নূরকে কোলে করে মামীমার কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা।

মামীমা কোন একটা কিছু করছিলেন মনিরাকে দেখামাত্র সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন– কি দাদু, খুব যে মায়ের কোলে চাপা হয়েছে। বলি ব্যাপার কি?

মনিরা নূরকে লক্ষ্য করে বললো– বলোনা বাবা, তুমি কি বলবে তোমার দাদীমাকে?

এগিয়ে এলেন মরিয়ম বেগম, নূরের গাল টিপে দিয়ে বললেন– বলো দাদু? বলো?

নূর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো– দাদীমা, আজ আমলা ছবি দেখতে যাবো।

ছবি!

মনিরা বললো এবার– মামীমা, নূর সখ করেছে, আজ নাকি সে ছবি দেখতে যাবে!

বেশ তো, সরকার সাহেবকে বলো, নিয়ে দাবেন উনি।

মামীমা।

বলো মা?

মতি মহল হলে সুন্দর একটা নাকি ছবি হচ্ছে, নতুন ছবি।

তাই নাকি? নতুন ছবি? যাও, মা-ছেলে দেখে এসো গে। নকিবকে বলো, সরকার সাহেবকে ডেকে দেবে 'খন।

এমন সময় সরকার সাহেব প্রবেশ করলেন কক্ষ মধ্যে– আমাকে ডেকেছেন?

মরিয়ম বেগম বললেন– সরকার সাহেব, মতি মহল হলে নাকি নতুন ছবি এসেছে?

জি হাঁ। বললেন সরকার সাহেব।

বললেন মরিয়ম বেগম– মনিরা ও নূর ছবি দেখতে যাবে, ওদের নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

মনিরা বলে উঠে– মামীমা, তোমাকেও যেতে হবে।

ম্লান হাসলেন মরিয়ম বেগম– আমার ও সব সখ মিটে গেছে মা, তোমরা যাও।

মনিরা পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো– আজ নূর তোমাকে ছাড়া কোথাও যাবেনা। নূর, সত্যি বলো তো, তোমার দাদীমাকে ছাড়া তুমি ছবি দেখতে যাবে?

মাথা দোলালো নূর– দাদীমা, আজ তোমাকে দেতে হবে। তুমি না দেলে আমি দাবোনা।

শুনলে মামীমা, শুনলে তো?

পাগলা দাদু, আমি বুঝি ছবি দেখতে যাবো?

কোনো দাবেনা দাদীমা? আমি তোমাকে ধলে নিয়ে দাবো। কথাটা বলে নূর মায়ের কোল থেকে নেমে মরিয়ম বেগমের হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো।

সরকার সাহেব হেসে বললেন– আজ নূর আপনাকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না বেগম সাহেবা।

মরিয়ম বেগম হাসতে লাগলেন।

মনিরা বললো– চলুন না মামীমা, নূর যখন সখ করেছে!

শেষ পর্যন্ত মরিয়ম বেগম মনিরা ও নূরের সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়ার জন্য রাজি হলেন।

❑

অগণিত জনতায় মতিমহল হলের সম্মুখভাগ ভরে উঠেছে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মোটর গাড়ি। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীর অসংখ্য ভীড়।

শো শুরু হবার আর বেশি বিলম্ব নেই।

মতিমহল হলে আজ প্রথম শুভমুক্তি 'কুন্তি বাঈ'–হল ফুল। বক্সের আসনে বসে আছে মরিয়ম বেগম আর মনিরা। সরকার সাহেব অদূরে নূরকে কোলে করে বসে আছেন, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছেন তিনি তার সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম অনেক দিন হতে সিনেমা দেখেন না, কাজেই তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

মনিরা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। ছবি দেখা তার উদ্দেশ্য নয়! উদ্দেশ্য তার ছবির নায়ককে দেখবে– সত্যই অন্য কেহ না, তার স্বামী দুস্য বনহুর।

পাশের আসনে এক যুবতী বসেছিলো।

মরিয়ম বেগম যুবতীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন, কারণ শো শুরু হবার এখনও কয়েক মিনিট বাকি।

বললেন মরিয়ম বেগম– তোমার বাড়ি কোথায় মা?

যুবতী অন্য কেহ নয়, গুলবাগ হোটেলের মালিকের কন্যা মিস পারভিন; যার লকেট এখন বনহুরের পকেটে।

তার বহু মূল্যবান লকেট খানা হারিয়ে যাওয়ায় যদিও মন মোটেই ভাল নয়, তবু নতুন ছবি দেখবার সখ দমিয়ে রাখতে পারেনি সে। এসেছে মা ও বোনের সঙ্গে।

মা ও বোন এক পাশে বসেছিলো, পারভিন কয়েকটা সিট সরে এসে বসেছে, এখান থেকে ছবি নাকি তার চোখে ভাল লাগে।

কথায় কথায় অনেক কথা বললো পারভিন, তার লকেট হারিয়ে যাওয়ার কথাও বললো সে মরিয়ম বেগম ও মনিরার কাছে।

শো শুরু হলো।

টাইটেল দেখানো হচ্ছে।

মরিয়ম বেগম অনিচ্ছা সত্বেও তাকিয়ে আছেন পর্দার দিকে। মনিরা পর পর চরিত্র ও নামগুলো পড়ে যাচ্ছিলো।

আতিয়া ফ্লিমের দ্বিতীয় অবদান 'কুন্তি বাঈ, প্রযোজক আরফান উল্লাহ, পরিচালক...........

মনিরা দ্রুত চরিত্র ও নামগুলো পড়ে যাচ্ছিলো।

আতিয়া ফ্লিমের দ্বিতীয় অবদান 'কুন্তি বাঈ'। প্রযোজক আরফান-উল্লাহ। পরিচালক নাহার চৌধুরী। শ্রেষ্ঠাংশে ঃ জ্যোছনা রায় ও মকছুদ চৌধুরী...........

মনিরার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলো– মকছুদ চৌধুরী....

পাশের চেয়ার থেকে পারভিন বলে উঠলো– নতুন কোন নায়ক হবে।

মনিরা কোন জবাব দিলো না।

শো শুরু হলো।

কয়েকটা দৃর্শ্যের পরই ছবির হিরোর আবির্ভাব হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা স্তব্ধ হয়ে গেলো– না না, তার মন যা বলেছিলো সেই সত্য। মকছুদ চৌধুরী নয়– তার স্বামী বনহুর।

মরিয়ম বেগম কি বলেন শোনার জন্যে উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে মনিরা। পর্দায় তাকিয়ে থাকলেও মন তার পড়ে রইলো মামীমার কণ্ঠ স্বর শোনার জন্য।

মরিয়ম বেগম বললেন– একি, আমি কি চোখে ধাঁ ধাঁ দেখছি? মনিরা, কি দেখছিস মা?

মামীমা, তুমি যা দেখছো তাই দেখছি।

এযে আমার মনির ছাড়া কেউ নয়। সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে ডাকলেন এখানে আসুন তো!

মরিয়ম বেগম আর মনিরার কথাবার্তায় বিরক্ত বোধ করছিল পারভিন। সেও কম আশ্চর্য হয়নি, এই যুবকই আজ সকালে তাদের প্লেনে কান্দাই এলেন। নিশ্চয়ই তিনি কুন্তি বাঈ ছবির হিরো। পারভিন স্বচক্ষে এই হিরোকে দেখেছে, এমন কি তার সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করেছে সে। পারভিন ভুলে গেলো তার লকেটের শোক। কৃন্তি বাঈ ছবির হিরোর সঙ্গে তার প্রকাশ্য আলাপ হয়েছে– এ কম কথা নয়। মনিরাকে লক্ষ্য করে গর্ব করে বললো– আজই আমি কুন্তি বাঈ ছবির হিরো মকছুদ চৌধুরীর সঙ্গে একই প্লেনে এলাম।

কথাটা কানে যেতে মনিরা ছবি দেখা বন্ধ করে তাকালো পারভিনের মুখের দিকে– মকছুদ চৌধুরীকে আপনি চেনেন?

হাঁ, তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। আজই তিনি তাঁর এক বান্ধবী সহ কান্দাই এসে পৌঁছেছেন।

সত্যি! মনিরা পারভিনের হাত মুঠোয় চেপে ধরলো।

পারভিন মনিরার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো। এ এমন করছে কেন? মকছুদ চৌধুরীর অপরূপ রূপ একে একবারে উন্মুক্ত করে তুলছে। কিছুটা রাগও হলো পারভিনের, ছবি দেখায় অসুবিধা হচ্ছে, কাজেই পারভিন উঠে চলে গেলো, যেখানে বসে ছবি দেখছিলো তার মা আর বোন।

মরিয়ম বেগম তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। দু'চোখে তার অপলক চাহনী। নিশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বিড় বিড় করে হঠাৎ বলে উঠেন– আমার মনির ছাড়া ও কেউ নয়। মকছুদ চৌধুরী ও নয়। আমার মনির.... দেখছোনা সেই?

সরকার সাহেব চশমাটা খুলে মুছে নিয়ে আবার বললেন– তাই তো মনে হচ্ছে বেগম সাহেবা!

মনিরা কিন্তু নিশ্চুপ স্থির হয়ে পর্দায় তাকিয়ে আছে। বেঁচে আছে, সুখে আছে, দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে চিত্রনায়ক হয়েছে– আর এক বারও মনে পড়ছে না তার কথা। কোথায় মা, কোথায় মনিরা আর কোথায় নূর। পুরুষ জাতটাই কি হৃদয়হীন!

ক্রমেই মনিরার অন্তর অভিমানে ভরে উঠে।

নায়িকার সঙ্গে স্বামীর এই ঘনিষ্ঠতা মনিরার হৃদয়ে একটা তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিলো। অসহ্য–অসহ্য এ দৃশ্য। বাসর কক্ষের দৃশ্যে মনিরা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো, না না, এসব সে নিজ চোখে দেখতে পারবে না। উঠে দাঁড়ালো মনিরা, নূরকে সরকার সাহেবের কোল থেকে টেনে নিয়ে বললো– চলো মামীমা, আর দেখবো না।

মরিয়ম বেগম তাঁর হারানো ধন ফিরে পেয়েছেন, তিনি হাঁ করে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখছেন আর বিড় বিড় করে বলছেন– আমার মনির বেঁচে আছে। আমি আগেই বলেছিলাম– সে আবার ফিরে আসবে।

মনিরা উঠে দাঁড়াতেই বললেন মরিয়ম বেগম– চলে যাচ্ছিস্ মা?

হাঁ, চলো মামীমা, ভাল লাগছে না।

মরিয়ম বেগম বললেন– আর একটু বস্ মা, ওকে দেখতে দে। প্রাণভরে একটু দেখতে.......

অগত্যা মনিরা বসতে বাধ্য হলো।

ইচ্ছে করেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো মনিরা। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ ফিরে থাকতে পারলো না সে। বহুদিন পর স্বামীকে দেখার লোভটুকু সংযত রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

ছবি শেষ হলে হল থেকে বেরিয়ে এলো তারা।

মরিয়ম বেগমের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। তিনি গাড়িতে বসে বললেন– আমার মনির বেঁচে আছে, খোদার কাছে আমি লাখো শুকরিয়া করছি।

মনিরা কোন কথা বললো না, নিশ্চুপ বসে রইলো স্থবিরের মত গাড়ির এক পাশে।

নূর তখন সরকার সাহেবকে একটির পর একটি প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

বাড়ি ফিরে মরিয়ম বেগম শোকরানার নামায আদায় করলেন। চাকর-বাকরদের ডেকে বললেন— ওরে তোরা শুনছিস– আমার মনির বেঁচে আছে। ভাল আছে সে। হাঁ, ভালই আছে, যেখানেই থাক সে, ভাল আছে।

মনিরা যে খুশি হয়নি তা নয়, স্বামী বেঁচে আছে, সুস্থ আছে– এতে কি তার আনন্দ নয়? অন্তরে আনন্দের হিল্লোল বইলেও মুখে তা প্রকাশ পেলোনা। একটা অভিমান দানা বেধে উঠলো তার মনের গহনে। তার স্বামী সুস্থ্য থেকেই তাকে ভুলে আছে, আজ দু'বছর হলো একটি দিনের জন্যও কি মনে পড়েনি একবার তাকে। পুরুষ-প্রাণ ঐ রকমই পাষাণ হয়।

নূরু ঘুমিয়ে পড়েছে কখন– পাশের ঘরে ঘুমিয়েছেন মরিয়ম বেগম। গোটা চৌধুরী বাড়ি ঝিমিয়ে পড়েছে। একটি প্রাণীও জেগে নেই।

শুধু চৌধুরী বাড়িই নয়, সমস্ত শহর সুপ্তর কোলে ঢলে পড়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাইভেট মোটর-কার এদিক থেকে ওদিকে চলে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

মনিরা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলো, কিছুতেই ঘুম আসছিলো না তার চোখে।

এ কি হলো! এমন তো কোন দিন হয়নি, আজ এতো অস্থির লাগছে কেনো। সেই যে ছবি দেখে আসার পর একটি বারের জন্য তার চোখের সম্মুখ হতে মুছে যায়নি স্বামীর মুখখানা। সেই পৌরুষ ভরা কণ্ঠস্বর। সেই দীপ্ত সুন্দর নীল চোখ দুটি। সেই কুঞ্চিত কেশ রাশি। প্রশস্ত ললাট, বলিষ্ঠ বাহু, মিষ্টি হাসি, সব যেন আজ আবার বেশি করে মনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারছে না, স্বামীর বুকে মুখ রাখবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো মনিরার প্রাণ।

নূরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলো।

রাত বেড়ে আসছে।
দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে কুকুরের গলার আওয়াজ।
মনিরা নিদ্রাহীন চোখে ঠিক্ তেমনি করে বসে আছে। যেমন সে বসেছিলো নূরের শিয়রে।
আলোটা ডিম করা ছিলো।
মনিরা ভাবছিলো, তার স্বামী যার সঙ্গে অভিনয় করলো কে সে মেয়ে, কে সে জ্যোছনা রায়। সত্যি কি তার স্বামীর সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের কোন সম্বন্ধ ঘটেছে। হয়তো তাই হবে নইলে এতোদিন কি করে সে ভুলে থাকতে পারে তাকে, আর স্নেহময়ী জননীকে।
মনিরার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।
ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন শার্শি খুলে গেলো আচম্বিতে।
মনিরা চমকে উঠলো, মশারীর বাইরে বেরিয়ে এলো, সে ভয় বিহ্বল চোখে তাকালো শার্শির দিকে।
পর মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। সমস্ত শরীরে জমকালো ড্রেস। মুখে কালো রুমাল বাধা। দক্ষিণ হস্তে রিভলভার।
বনহুরকে দেখেই মনিরার চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়লো সে তার বুকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো– এসেছো?
বনহুর নিজের মুখের রুমাল খুলে ফেললো, গভীর আবেগে মনিরাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বললো– এসেছি। মনিরা কেমন ছিলে?
মনিরা ভুলে গিয়েছিলো অভিমান, ভুলে গিয়েছিলো কিছুক্ষণ আগের কথাগুলো। স্বামীর প্রথম দর্শনে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলো সে।
এবার মনিরার মনে উঁকি দেয় রাগ, ক্ষোভ আর অভিমান। স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে মনিরা– কেনো এলে তুমি!
বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠে বনহুর– সেকি মনিরা?
হাঁ, না এলেই খুশি হতাম বেশি।
মনিরা! ব্যাকুল কণ্ঠে বললো বনহুর।
মনিরার অভিমান মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো ভীষণভাবে। এতোদিনের স্বামীর বিরহ-বেদনা আজ একযোগে ধাক্কা মারলো তার বুকে। কঠিন গলায় বললো– আমি বেশ ছিলাম, আবার কেনো আমাকে বিরক্ত করতে এলে বলো তো?
মনিরা, এ তুমি কি বলছো?
না, না, তুমি চলে যাও, আমি চাইনা তোমাকে।

বনহুরের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে। কত আশা আর আকাঙ্খা নিয়ে সে আজ হোটেল থেকে রাতের অন্ধকারে চলে এসেছে। এখনও সে আস্তানায় গিয়ে পৌঁছে নাই। নূরীকে হোটেলে রেখে সে এই রাতের প্রতীক্ষায় ছিলো। সব বাসনা মুহূর্তে ধুলিস্মাৎ হয়ে গেলো।

বনহুর টেবিলের পাশে চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লো। দু হাতে মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়তে লাগলো সে। অধর দংশন করতে লাগলো।

মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বনহুরের অন্তরের দাহ মনিরার হৃদয়ে যে আঘাত করছেনা, তা নয়। তার মনটাও ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠছে। কতদিন পর স্বামীকে পেয়েও সে যেন পাচ্ছে না, কোথায় যেন বাধা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, টেবিল থেকে রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে বললো– বেশ, আর আসবোনা।

মনিরার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু একটা দারুণ অভিমান তাকে যেন সংজ্ঞাহারা করে ফেলেছিলো। স্বামী চলে যাচ্ছে, তবু এক পাও এগুতে পারছে না।

বনহুর যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো মনিরার কক্ষ থেকে।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই মনিরা ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত নূর কে বুকে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। কেনো সে এমন ভুল করলো, কেনো সে স্বামীকে অমন বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলো। কেনো বলতে পারলো না মনের গোপন কথা। সে তো কিছুই জানলোনা বা বুঝতে পারলোনা। মনিরা যা বললো সে তার মনের কথা নয়। সে ভুল বুঝলো তাকে, হয়তো আর কোন দিন সে আসবেনা। একি করলো মনিরা, কত আরাধনার পর তবেই না তাকে ফিরে পেয়েছিলো। কেনো সে এমন কাজ করলো। ব্যথা-বেদনায় ভেংগে পড়লো মনিরা।

❑

মনিরার নিকট থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে চললো বনহুর। বহুদিন পর কত আশা আকাঙ্খা আর বাসনা নিয়ে ছুটে গিয়েছিলো সে মনিরার পাশে। মনিরা আজ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে– ভাবতেও পারেনি সে।

মনিরাকে একটু দেখবার জন্য কতদিন ধরে মন তার অস্থির হয়ে পড়েছিলো। মনিরার বিরহ-বেদনা তাকে অহঃরহঃ উদ্বিগ্ন করে রাখতো, আর আজ সেই মনিরা তাকে ....না, না, মনিরা তো এমন ছিলনা কোনদিন। আজ সে এতোদিন পর তাকে কাছে পেয়েও এতোটুকু খুশি হলো না। কেনো, কেনো মনিরা এমন হলো..........

বনহুর আপন মনে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ তার কানে এলো কোন এক করুণ কণ্ঠের বিলাপ ধ্বনি।

–মায় ভূখা হুঁ, খোদা কে ওয়াস্তে মুঝে কুছ খানা দো-- মায় ভূখা হুঁ----

থমকে দাঁড়ালা, বনহুর, কান পেতে শুনলো শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে।

তখনও করুণ আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে– খোদা কে ওয়াস্তে মুঝে কুছ খানা দো।

বনহুর অন্ধকারে এগিয়ে গেলো, দেখতে পেলো– অদূরে ফুটপাতে এক বৃদ্ধ বসে বসে ধুকছে, আর বিলাপ করছে।

বনহুর বৃদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, পকেটে হাত দিয়ে বিমর্ষ হলো– পকেট শূন্য। দ্বিতীয় পকেটে হাত দিতেই হাতে উঠে এলে সেই লকেটখানা, যে লকেটখানা বনহুর কৌশলে পারভীনের কণ্ঠ থেকে আত্মসাৎ করেছিলো।

বনহুর বেশি কিছু চিন্তা করবার অবসর পেলো না, লকেটটা গুঁজে দিলো বৃদ্ধের হাতের মুঠায়।

দু'হাত তুলে বৃদ্ধ দোয়া জানাতে লাগলো।

বনহুর তখন নিজের গন্তব্য পথে পা বাড়িয়েছে।

❑

হোটেল– কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে গেলো শয্যার দিকে। চমকে উঠলো বনহুর নূরী তার বিছানায় শায়িত। শিয়রের টেবিলে ডিম লাইট জ্বলছে।

বনহুর নূরীর ঘুমন্ত মুখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

মনিরার মুখখানা ভেসে উঠলো তার চোখের সম্মুখে। নূরীর মুখ মুছে গেলো ধীরে ধীরে।

বনহুর নূরীর পাশে বসে হাত রাখলো নূরীর হাতে।

চমকে জেগে উঠলো নূরী, ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চোখ রগড়ে বললো নূরী– হুর, কখন এলে?

নূরী জেগে উঠতেই বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বললো– এখনই এলাম।

কোথায় গিয়েছিলে?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে ওদিকের খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে আসে বনহুরের পাশে – ও ঘরে আমার বড় ভয় করছিলো হুর।

বেশ, তুমি এ কক্ষেই শোও।

আর তুমি?

আমার ঘুমের কোন প্রয়োজন হবে না।

সেকি হুর?

নূরী! বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিলো। কিন্তু মুহূর্তে নূরীকে সরিয়ে দিয়ে বললো বনহুর– তুমি শুয়ে পড় নূরী, আমি মেঝেতে শুচ্ছি।

বনহুর একটা চাদর আর বালিশ নিয়ে হোটেল কক্ষের মেঝেতে শুয়ে পড়লো।

নূরী দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে বললো– রাত বেশি নেই। খুব ভোরে আমরা আস্তানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো। একটু ঘুমিয়ে নাও।

নূরী বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

❑

বনহুর যখন আস্তানায় পৌঁছলো তখন তার অনুচরগণের মধ্যে একটা আনন্দমুখর সাড়া পড়ে গেলো। সর্দারকে ফিরে পেয়েছে– এ যেন তাদের রাজ্যজয়ের আনন্দ। সর্দার তাদের শুধু মনিব নয়, পরম আপন জনের চেয়েও অধিক।

সমস্ত আস্তানাটা ঝিমিয়ে পড়েছিলো যেন। কারো মনে ছিলোনা এতটুকু খুশি। সবাই খেতো- ঘুমাতো-বেড়াতো। দরকার মত দস্যুতা করতেও বের হতো কিন্তু তবু যেন কারো মনে শান্তি ছিলোনা।

রহমান তাদের পরিচালনা করতো বটে, তা হলেও সর্দারের অভাব সকলের মনে একটা হাহাকার জাগাতো। কি যেন ছিলো, কি যেন নেই- এমনি লাগতো সকলের। যদিও অনুচরগণ দস্যু বনহুরকে ভয় করতো ভীষণ ভাবে, তবুও শ্রদ্ধা করতো অনেক।

বিশেষ করে অশ্ব তাজকে নিয়ে আস্তানার সকলের মনে একটা দুঃশ্চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছিলো।

তাজের শরীর দিনদিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছিলো। প্রভুর অন্তর্ধানে পশু হলেও তাজ মানুষের মত ব্যথায় মুষড়ে পড়েছিলো। বনহুর যেবার কারাগারে বন্দী হয়েছিলো সেবারও তাজকে নিয়ে বনহুরের অনুচরগণ বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলো।

বনহুরের অনুপস্থিতিতে তাজ কিছুই খেতোনা, সব সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতো, কার যেন প্রতীক্ষায় সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকতো। রহমান নিজে জোর করে তাজের মুখে তুলে ছোলা আর ধান খাইয়ে দিতো। পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতো। গা ঘেষে দিত।

আর্জ বনহুরকে পেয়ে তাজ যেন আনন্দে আপ্লুত হলো। মুখ মাথা ঘষতে লাগলো সে বনহুরের শরীরের সঙ্গে। শুকতে লাগলো নাক দিয়ে বনহুরের গোটা শরীর। সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো তাজ।

বনহুরও তাজের মনোভাব বুঝতে পারলো- পিঠ ঘাড় নেড়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

তাজ যে সম্মুখের পা মাটিতে আঘাত করে প্রভুকে পিঠে উঠার জন্য ইংগিত করছে, বুঝতে পারলো বনহুর।

বনহুর যখন তাজকে আদর করছিলো তখন বনহুর দাঁড়িয়ে ছিলো তার পাশে। অদূরে দাঁড়িয়ে বনহুরের আদেশের প্রতিক্ষা করছিলো আরও কয়েকজন অনুচর। আজ সকলের মুখমণ্ডলই আনন্দোজ্জ্বল।

শুধু আস্তানা আর অনুচরগণের মনেই খুশির জোয়ার বয়ে চলেনি, সমস্ত বনভূমি যেন আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। বসন্ত ফিরে এলে বসুন্ধরা যেমন নতুন রূপ ধারণ করো তেমনি বনহুরের আগমনে গাছের শাখায় শাখায় দোলা জাগলো, ফুল ফুটলো, বাতাস বইলো, ডালে ডালে পাখি গান গাইলো।

বনহুরের মনেও যে খুশির দোলা লাগেনি তা নয়। বহুদিন তার পর তার মনে এক অফুরন্ত আনন্দ দ্যুতি খেলে যাচ্ছিলো, কিন্তু এতো খুশির মধ্যেও বনহুর সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করছিলো না। মনিরার কঠিন বাক্যগুলো তার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানছিলো। যতই সে ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলো, ততই আরও বেশি করে মনে হচ্ছিলো মনিরার মুখখানা। এদিকে নূরীকে নিয়ে আর একটা বিভ্রাট শুরু হলো। আস্তনায় পৌছেই আমার মনি কই, মনি কই' বলে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

বনহুর আস্তানায় পৌছেই রহমানকে বলে দিয়েছিলো, তারা যেন নূরীকে বলে– তার মনি আছে, এক ধাত্রীর কাছে তাকে লালন-পালনের জন্যে দেওয়া হয়েছে। এবার ফিরিয়ে আনা হবে।

বনহুর এক সময় রহমানকে নিকটে ডেকে নিয়ে নিভৃতে সব কথাই বললো। চলে যাবার পর থেকে তার জীবনে কি ঘটেছে সমস্তই বললো সে রহমানের কাছে। নূরীর হারিয়ে যাওয়া এবং তাকে উদ্ধার করা কোন কথাই বাদ দিলো না। তারপর নূরী কি ভাবে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলো, কিভাবে তার জ্ঞান লাভ হলো, বললো বনহুর। অনুচরদের মধ্যে সে রহমানকে সব চেয়ে বিশ্বাস করতো এবং মনের কথা সব বলতো তার কাছে।

রহমানের মুখে বনহুর শুনলো মনিরার সংবাদ।

ছদ্মবেশে রহমান প্রায়ই শহরে গিয়ে মনিরার সন্ধান নিতো, মনিরা সর্দারের জন্য কত চিন্তিত-ব্যথিত, জানতো সে। মনিরার মুখে রহমান কোনদিন হাসি দেখে নি, যেদিনই সে তাকে দেখেছে– অশ্রু ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি।

রহমান সব খোলসা করে বললো সর্দারের নিকট।

রহমানের কথা শুনে হেসে বললো বনহুর– রহমান, তুমি যা বললে, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আমার মনে হচ্ছে।

রহমান মনিবের মুখে এমন উক্তি শুনবে আশা করেনি, বললো সে–সর্দার, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলার দুঃসাহস আমার নেই।

বনহুর ললাট কুঞ্চিত করে বললো– বৌ রাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছো রহমান। আমি গত রাতে তার নিকটে গিয়েছিলাম।

রহমানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে পরবর্তী কথা শুনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

বনহুর বসেছিলো, উঠে দাঁড়ালো, নিজের চুলের মধ্যে আংগুল চালাতে চালাতে বললো– তার কাছে যে ব্যবহার আমি কাল পেয়েছি, বলবার নয়।

সর্দার! অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠলো রহমান।

বনহুর কিছুক্ষণ আপন মনে পায়চারী করতে লাগলো। মুখভাব গম্ভীর।

রহমান নিশ্চুপ তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে বললো বনহুর– রহমান!

সর্দার!

রহমান, বিয়ে আমি করিনি, আমার মায়ের আদেশ পালন করেছি মাত্র ....

সর্দার!

ওখানে আর কোন দিন তুমি যাবে না রহমান, আমার আদেশ।

সর্দার আপনি ভুল করছেন। বৌ-রাণীর উপর আপনি অযথা রাগ করছেন। সর্দার, বৌ-রাণীই শুধু নেই সেখানে, সেখানে রয়েছে আপনার সন্তান....

বনহুর রাগত কণ্ঠে গর্জে উঠলো– আমার সন্তান?

হাঁ, বৌ রাণী নূরকে খুজে পেয়েছে।

নূর!

সর্দার, নূর আপনার সন্তানের নাম। ভুলে গিয়েছেন আপনি?

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো বনহুর রহমানের মুখের দিকে।

রহমান অন্যদিন হলে ভড়কে যেতো, আজ এতটুকু বিচলিত হলো না, গলায় জোর দিয়ে বললো– সর্দার, নূর– সে যে আপনারই প্রতিচ্ছবি। নূরের মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছি আপনাকে! সর্দার বৌ-রাণীর প্রতি আপনি বিমুখ হবেন না।

❑

রহমান দস্যু হলেও তার মন উন্নত ছিলো এবং জ্ঞান গরিমাতেও সে কম ছিলো না। বনহুরকে নানা ভাবে বুঝাতে লাগলো রহমান।

বনহুর যখনই একা বসে বিশ্রাম করতো তখনই পাশে গিয়ে দাঁড়াতো রহমান–সর্দার!

বনহুর মনের চঞ্চলতাকে গোপন করবার জন্য মুখভাব স্বাভাবিক করে বললো – কে রহমান?

হাঁ সর্দার?

কি খবর বলো?

সর্দার, আপনি বৌ-রাণীকে...

বৌ-রাণী –বৌরাণী তোমাকে বলেছি, ও নাম আমার সম্মুখে আর মুখে আনবে না।

সর্দার, আমি জানি বৌ-রাণীকে আপনি ভুল বুঝছেন। বৌ রাণীকে আজও আপনি চিনতে পারেননি।

বনহুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে– আমার চেয়ে তোমরাই তাকে বেশি চেনো বলতে চাও?

না সর্দার, কিন্তু বলছিলাম যে বৌ-রাণীর উপর আপনি অযথা রাগ করেছেন। তিনি এমন কোন কারণে আপনার উপর ...

রহমানকে কথা শেষ করতে দেয় না বনহুর, হুঙ্কার ছাড়ে সে– বনহুর নারী জাতিকে করুণা করে, সমীহ নয়। আমি মনিরাকে করুণা করেই গ্রহণ করেছিলাম।

সর্দার, আপনি বলতে চান বৌ-রাণীকে আপনি ভাল না বেসেই বিয়ে করেছেন? করুণাই আপনাকে এতদূর অগ্রসর করতে সক্ষম হয়েছে?

রহমান আজ ভুলে গেলো– সে সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। যে সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কোনদিন কথা বলতে পারেনি– আজ রহমান চোখ-মুখ বন্ধ করে জলস্রোতের মতই বলে চললো। সর্দার, আপনি আজ ক'দিন এসেছেন, কই একটি দিনও তো আপনাকে প্রাণ খুলে হাসতে দেখলাম না। অহঃরহ অন্তরে আপনার মনে একটা ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে, এটা আর কেউ না বুঝালেও আমি বুঝতে পেরেছি। সবার চোখে ধূলো দিলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সর্দার, বৌ-রাণীকে আপনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন না করুণা করে? বলুন?

শক্তিতে বনহুর শক্তিমান হলেও রহমানের কথায় সে পরাজিত হলো তার কাছে। সত্যিই তো মনিরাকে সে করুণা করে বিয়ে করেনি। বিয়ে করেছে মায়ের অনুরোধে আদেশে। মনিরাকে ভালবাসতো বনহুর– সে কথা মিথ্যা নয়। তাই বলে ভালবাসার বিনিময়ে কি বিয়ে........

বনহুরের চিন্তায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো রহমান– সর্দার!

বনহুর এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো– রহমান, আমি স্বীকার করলাম, মনিরাকে আমি ভালবাসি। তাই বলে কোন নারীর রূঢ় আচরণ দস্যু বনহুর সহ্য করবে না।

এরপর রহমান আর কোন কথা বলতে পারলো না, ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো– রহমান ভাইকে অমন করে বকলে কেনো হুর?

বনহুর আর একটা কঠিন উক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলো। ভেবেছিলো, নূরী আড়াল থেকে সব শুনেছে কিন্তু এখন বুঝতে পারলো, রহমান আর তার মধ্যে যে আলোচনা হলো,কিছুই শুনতে পায়নি নূরী। শুনতে পেলে একটা ঝড়-ঝাপটা শুরু হতো এতোক্ষণ। কারণ, বৌ-রাণী নামটা নূরী কিছুতেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

নূরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়লো– মনিকে কবে আনবে বলো?

বনহুর শান্ত কণ্ঠে বললো– সে জন্যই তো রহমানকে বকলাম।

কেনো?

মনিকে আজও সে আনতে যায়নি বলে?

আচ্ছা, আমিও ওকে দেখাচ্ছি মজাটা। নূরী উঠতে গেলো, বনহুর অমনি হাতখানা চেপে ধরলো নূরীর।

–বসো নূরী।

না, আমার মনির জন্য মন কেমন করছে। হুর, আমার মনিকে কেনো তোমরা এনে দিচ্ছো না?

বলেছি তো সে তার ধাত্রীমাতার নিকটে আছে।

আমি কোন কথা শুনবো না, আমার মনিকে এনে দাও। আমার মনিকে এনে দাও। হুর, আমার মনিকে এনে দাও...... মনিকে এনে দাও.....

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে– আমি কোন কথা শুনবো না। আমার মনিকে এনে দাও। প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো নূরী।

বনহুরের মনের অবস্থা আজ মোটেই ভাল ছিলো না, নূরীর হাত দু'খানা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো– আমি জানিনা কোথায় তোমার মনি।

সঙ্গে সঙ্গে নূরী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে পড়লো, ঠোঁট দুখানা একটু নড়ে উঠলো মাত্র। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো বনহুরের দিকে।

বনহুর অধর দংশন করতে লাগলো, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো তার ললাটে।

কিছুক্ষণ দ্রুত পায়চারি করে ফিরে তাকালো বনহুর নূরীর দিকে। নূরী তখনও স্থির ভাবে বসে আছে কেমন যেন চিত্রাপিতের মত।

নূরীকে এভাবে পুতুলের মত নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে চমকে উঠলো বনহুর। দুশ্চিন্তায় মনটা ভরে উঠলো, আবার ওর মাথাটা গুলিয়ে যাবে না তো! ভিতরে ভিতরে আশঙ্কিত হলো সে। এগিয়ে গেলো বনহুর, নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে তুলে বললো– -----নূরী!

নূরী, তোমার মনিকে আমি এনে দেবো। এনে দেবো নূরী......

নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর নূরীর পাশে বসে ওকে টেনে নেয় কাছে, চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। সান্ত্বনার কণ্ঠে বলে– লক্ষ্মীটি কেঁদোনা, তোমার নূরীকে আমি এনে দেবো– কথা শেষ করে বনহুর আনমনা হয়ে যায়। সত্যি কি সে মনিকে এনে দিতে পারবে? কোথায় মনি, সে এমন কত বড় হয়েছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে। এতো বড় মিথ্যা বলে বনহুর চিন্তিত হয়ে পড়লো।

নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে চললো বনহুর।

নূরী বনহুরের বুকে মাথা গুঁজে উচ্ছ্বাসিত ভাবে কেঁদে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো মনি ছাড়া আমি বাঁচবো না। বাঁচবো না হুর!

নূরী! কেঁদোনা লক্ষ্মীটি ....

❑

মনিবের মনের অস্থিরতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে লাগলো রহমান। বহুদিন পর সর্দারকে তারা ফিরে পেয়েছে– কত আনন্দ! কিন্তু সর্দার যদি সব সময় চিন্তিত থাকে তবে কিভাবে তাদের কাজ হবে।

শহরের নানা স্থানে আবার দেখা দিয়েছে নানা রকম অরাজকতা। পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে শয়তান লোকগুলো আবার ফেঁপে উঠেছে বেলুনের মত। গোপনে তারা অসহায় জনগণের রক্ত শুষে নিচ্ছে নীরবে।

রহমান সব সন্ধানই নিয়েছে। তাদের যতটুকু সম্ভব সায়েস্তাও করেছে কিন্তু আরও প্রয়োজন। এবং ওদের সায়েস্তা করতে হলে চাই সর্দারের সহায়তা।

রহমান প্রায়ই ছদ্মবেশে শহরে প্রবেশ করতো। গোপনে সন্ধান নিয়ে ফিরতো সে! বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান, বনহুরের মতই তার মহৎ উদ্দেশ্য। ধনীর ধন লুটে নিয়ে ধনহীন অনাথাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই তার ব্রত।

আজও রহমান ভাল বাসেননি কোন নারীকে, নূরীই ছিলো তার একমাত্র স্বপ্ন। কিন্তু যখন সে জানতে পেরেছে নূরী ভালবাসে তার মনিব দস্যু বনহুরকে— সে দিন থেকে রহমান নূরীকে এড়িয়ে চলতো। নূরীর স্মৃতির হৃদয় সিংহাসনে সংগোপনে রেখে ভুলে থাকতো মানবদেহী নূরীকে। দূর থেকে নূরীকে রহমান পূজা করতো, কিন্তু কোনদিন বিরক্ত করতো না সে তাকে।

একদিন বনহুর আর রহমান বসেছিলো নির্জন ঝর্ণার ধারে। অদূরে তাজ আপন মনে ঘাস খাচ্ছিলো।

বনহুর একটা ঘাসের খন্ড নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিড়ে ফেলছিলো। মুখভাব গম্ভীর ভাবাপন্ন। তাকিয়ে ছিলো সে সম্মুখস্থ বয়ে চলা ঝরণার পানির দিকে।

বনহুরের অদূরে রহমান বসেছিলো, তার মুখমণ্ডলও বেশ চিন্তাযুক্ত। বললো রহমান সর্দার বহুদিন আপনি দেশছাড়া। এতো দিন দেশে আপনি না থাকায় নানা রকম অনাচার শুরু হয়েছে। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে কতগুলো চোরাকারবারী যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। কত নিরীহ জনগণের রক্ত যে তারা শোষণ করছে তার ঠিক নেই।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো– তুমি এতোদিন কি করেছিলে রহমান?

সর্দার, আমি যতটুকু সম্ভব শয়তানদের সায়েস্তা করতে চেষ্টা নিয়েছি। কিন্তু বেশি কিছু করে উঠা সম্ভব হয়নি। কারণ পুলিশের সহায়তায় তারা বেঁছে গেছে। পুলিশ মনে করেছে, তারা হৃদয়বান লোক, কাজেই........

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কারা সেই দুষ্ট শয়তানদের দল?

সর্দার, সবচেয়ে দেশের জনগণের বিস্তর ক্ষতি সাধন করছে একটি ধনবান ব্যক্তি, নাম তার মহব্বৎ আলী। সে শুধু জনগণের ক্ষতিই সাধন করছে না, দেশের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি করেছে সে?

মহব্বৎ আলী প্রচুর অর্থবান লোক। শহরে এবং বিদেশে তার বহু কারবার আছে, যে সব কারবারে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন হয়ে থাকে। একটা হোটেল আছে– যেখানে শহরের সৎ ব্যক্তিদের প্রলোভন দেখিয়ে অসৎ পথে আনা হয়। মদ পান, জুয়া খেলা এবং বাঈজী নাচ সব হয়ে থাকে সে হোটেলে। হোটেলের অভ্যন্তরে আরও অনেক কুৎসিৎ কাজ সমাধা হয়ে থাকে।

হু। বনহুর একটা শব্দ করে উঠলো।

রহমান বুঝতে পারলো, তার মনিবের চিন্তাধারা বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সব সময় সর্দারের বিমর্ষতা অন্যান্য অনুচরদের তেমন করে ভাবিয়া না তুললেও, রহমান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। এবার ঔষধ ধরেছে, রহমান মহব্বৎ আলীকে সায়েস্তা করতে না পেরে ভীষণভাবে ক্ষেপেছিলো।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছু ভাবতে লাগলো।

রহমানের অতি পরিচিত সর্দারের এ মুখভাব, মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো সে।

বনহুর বললো– রহমান, প্রস্তুত থেকো, আজ রাতেই একবার শহরে যাবো।

আচ্ছা, সর্দার।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো— চলো।

রহমানও নীরবে অনুসরণ করলো।

বনহুরের অশ্ব আর রহমানের অশ্ব তখন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে।

উভয়ে উঠে বসলো নিজ নিজ অশ্বে।

☐

রহমান এক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজ অশ্ব নিয়ে রওয়ানা দিলো। কাউকে সে কোন কথা বললো না– কোথায় যাচ্ছে, কেনো যাচ্ছে। বনবাদাড় আর জঙ্গল ছেড়ে রহমানের অশ্ব শহরের পথ ধরে এগুলো। রহমানের শরীরে আজ পাহারাদারের শুভ্র ড্রেস।

একটা বড় দোকানের সামনে অশ্ব রেখে নেমে পড়লো রহমান। কিছু খাবার আর খেলনা নিয়ে উঠে বসলো আবার অশ্বপৃষ্ঠে।

সোজা গিয়ে পৌঁছলো রহমান চৌধুরী বাড়ির বাগানের পাশে।

আজ ক'দিন থেকে মনিরার মনের অবস্থা অত্যন্ত অবর্ণনীয়। নাওয়া-খাওয়া সব সে ত্যাগ করেছে। এমনকি নূরকে আদর করাও সে ভুলে গেছে যেন।

হঠাৎ মনিরার এ অবস্থা দর্শন করে মরিয়ম বেগম অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভেবে পান না কেনো সে এমন হলো।

সেই ছবি দেখার দিন হতে মনিরার মধ্যে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন মরিয়ম বেগম। বুঝতে পেরেছেন স্বামীর কথাই মনিরাকে এভাবে চিন্তাক্লিষ্ট ও ভাবাপন্ন করে ফেলেছে।

তাই মরিয়ম বেগম তেমন করে কোন কথা না বললেও মাঝে মাঝে বলতেন– মা মনিরা, ভাবিসনে, আমার মন বলছে- সে আসবে। আমি মা, ওর কিছু হলে আমার মন বলতো। কিন্তু আমার মনে সান্ত্বনা আছে সে আসবে...........

মরিয়ম বেগমের কথার কোন জবাব দেয় না মনিরা। সে আসবে---- মায়ের মনে কত আশা। জানেনা না তিনি– যার আসার আশায় তিনি পথ চেয়ে আছেন, সে এসেছিলো। এসে আবার সে চলে গেছে, তাঁকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছে মনিরা নিজে।

মরিয়ম বেগম যতই মনিরাকে সান্ত্বনা দিতেন ততই মনিরার হৃদয়ের ব্যথা না কমে আরও বেড়ে যেতো। কোন রকমে মামীমার দৃষ্টির আড়ালে চলে এসে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদতো।

হয়তো নূর দেখে ফেলতো, ছুটে এসে মায়ের পাশে বসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলতো– আম্মা, তুমি কাঁদতো কেনো? আম্মা, বলো না তুমি কাঁদতো কেনো?

মনিরা শিশু-পুত্রের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতো।

নূর কিছু বুঝতে না পেরে ছুটে যেতো মরিয়ম বেগমের কাছে। গলা জড়িয়ে ধরে বলতো নূর– দাদীমা, আমাল আম্মার কি হয়েতে? আমাল আম্মা কাঁদতে কেনো?

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বলতেন– সেকি! আম্মা কাঁদছে? চলো তো দেখি।

ছোট্ট নাতীর হাত ধরে মরিয়ম বেগম আসেন মনিরার কক্ষে।

মনিরা তখন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁলে ফুঁলে কাঁদছে।

মরিয়ম বেগম মনিরার পিঠে হাত রেখে বললেন– ছি ঃ মা, অমন করে কাঁদতে নেই! আমি মা হয়ে দেখতো, বুকে কেমন পাষাণ চাপা দিয়ে আছি। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন আবার তিনি– ওর সঙ্গে তোকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে আমি ভুল করেছি মনিরা। ভেবেছিলাম তোকে দিয়ে ওকে আমি আটকে রাখবো, কিন্তু সে আশা আমার বিফল হয়েছে। বনের পাখিকে কেউ কোনদিন খাঁচায় আবদ্ধ রাখতে পারেনা, তাকে যতই দুধ কলা খাওয়ানো যায়.....

মামীমা! মামীমা....... মনিরা মরিয়ম বেগমের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বাসিত ভাবে কেঁদে উঠে।

মনিরা, যে ভুল আমি করেছি তার প্রতিকার নেই। একটা জীবন এমনি করে আমার চোখের সম্মুখে বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর আমি তাই সহ্য করবো। মা, আমাকে তুই তিরস্কার কর, তিরস্কার কর মা।

মনিরা সোজা হয়ে বসলো, আঁচলে চোখের পানি মুছে বললো –মামীমা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। কে বললো তোমাকে, আমার জীবন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

আমি কি কিছুই বুঝিনা মনিরা? তোর অন্তরের ব্যথা আমি কি কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনা? মা হলেও আমি নারী। নারীর সর্বস্ব যে তার স্বামী..........

মামীমা!

মনিরা, কি করবো বল, আমি তোকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছি। এ বয়সে কে না তার স্বামীকে পাশে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। কাঁদ, আরও কাঁদ, কেঁদে কেঁদে তবু যদি বুকটা তোর হাল্‌কা হয়।

একটু থেমে কঠিন কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম– আমি মা হয়ে ওকে অভিসম্পাত করছি, ওর যেন.......

মনিরা দক্ষিণ হস্তে মরিয়ম বেগমের মুখ চাপা দিয়ে বলে উঠলো –না না, তাকে তুমি অভিসম্পাত করোনা। অভিসম্পাত করোনা মামীমা। মায়ের অভিশাপ সবচেয়ে মন্দ। ওর কোন অমঙ্গল হবে এ আমি সইতে পারবো না। তিলে তিলে আমি মরণ বরণ করবো, কিন্তু ওকে আমি অভিশাপ দিতে দেবো না------ মামীমা-----মামীমা-----

মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। নীরবে তিনি মনিরার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে চললেন।

নূর তখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ই বা কাঁদছে কেনো, আর দাদীমা-ই বা কাঁদছে কোনো, কিছুই বুঝতে পারে না অবুঝ শিশু নূর।

এমন সময় নকীব এলো; যদিও সে মরিয়ম বেগম ও মনিরাকে অশ্রুভরা নয়নে দেখতে পেলো তবু না বলে পারলো না, বললো সে– আপামনি সেই লোকটা এসেছে, ঐ যে নূরকে যে ভালবাসে, খেলনা দেয়....

মনিরা জানে রহমান আসে– সে-ই নূরের জন্য খেলনা আর খাবার নিয়ে আসে। অনেক করে বারণ করা সত্ত্বেও সে এ কাজ করে। অনেক দিন মনিরাকে বলেছে রহমান–বৌ-রাণী, আমি তো নিজের টাকায় এ সব করছিনা, ওর বাপের টাকার জিনিস। কেনো আপনি রাগ করেন বৌ-রাণী? - নকীবের কথায় রহমানের কথাগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠে মনিরার।

আঁচলে চোখের পানি মুছে উঠে দাঁড়ায় মনিরা, হঠাৎ যেন তার মুখের ভাব বদলে যায়। মরিয়ম বেগমকে লক্ষ্য করে বলে সে– মামীমা, রহমান এসেছে। আয় নূর–নূরকে কোলে করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় মনিরা।

মরিয়ম বেগম আশ্বস্ত হন। রহমানের পরিচয় তিনি জানেন। মনিরা মামীমাকে সব খুলে বলেছেন– রহমান তার স্বামীর প্রধান অনুচর। এ বাড়ির আর একজন জানেন রহমানের আসল পরিচয়– তিনি হলেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব। মনিরা মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব ছাড়া কার কেউ জানেনা– রহমান কে। এমন কি বিশ্বাসী চাকর নকীবও না।

পুত্রের প্রধান অনুচর এবং বিশ্বাসী জন বলেই মরিয়ম বেগম মনিরাকে কোনদিন রহমানের সম্মুখে যেতে বারণ করেননি। মনিরা প্রায়ই রহমানের মুখে তার স্বামীর আস্তানার সংবাদ শুনতো। আরও কত কথা বলতো রহমান, সর্দারের গুণগানে মুখর হয়ে উঠতো সে।

মনিরার শুষ্ক প্রাণে স্বামীর কাহিনী কিছুটা শান্তি দান করতো। আজ কতদিন রহমান বনহুরের পাশে রয়েছে, বনহুরকে সে যেমন করে জানতো আর কেউ তেমন করে জানতো না। তাই রহমানের কাছে মনিরা সন্ধান পেতো তার স্বামীর।

নূরকে কোলে করে মনিরা এসে দাঁড়ালো হল ঘরে।

রহমান যেমন করে কুর্ণিশ জানায় তার সর্দারকে, তেমনি করে কুর্ণিশ জানাতো বৌ-রাণীকে।

কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রহমান।

নূর মায়ের কোল থেকে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলো রহমানকে– আমার জন্যে কি এনেতো সিপাহী?

মনিরা রহমানকে সিপাহী বলে সম্বোধন করতো। নূরও মায়ের কাছে এ উক্তিটাই শিখে নিয়েছিলো।

নূরকে রহমান তুলে নিলো কোলো, হেসে বললো– ছোট সর্দার, তোমার জন্য অনেক জিনিস এনেছি।

কই, দাও?

রহমান পাশের টেবিলে রাখা প্যাকেটগুলো তুলে দিলো নূরের হাতে– এই নাও ছোট সর্দার।

রহমান নূরকে ছোট সর্দার বলতো।

মনিরা অবশ্য প্রথম প্রথম রাগ করতো। বলতো– ও নাম ধরে ডেকোনা সিপাহী।

রহমান হেসে বলতো– কেন বৌ-রাণী?

না, ও নাম আমার সহ্যের বাইরে। তোমাদের সর্দার অমানুষ বলে, আমার নূর অমানুষ হবে?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছিলো রহমান, বলেছিলো– আমাদের সর্দার অমানুষ কে বললো এ কথা আপনাকে? মানুষ যদি থাকে তবে মানুষ আমার সর্দার। ভয় কাকে বলে জানে না সে। শয়তান জানোয়ার যারা নিরীহ মানুষের বুকে বসে রক্ত শুষে খায়, তাদের টুটি ছিড়ে ফেলতে কসুর করেনা। দুষ্ট লোকদের বুকে গুলী করতে এতটুকু হাত কাঁপেনা। শয়তানের শত্রু, অনাথার বন্ধু--- তাকে আপনি অমানুষ বলেছেন বৌ-রাণী?

এর পর থেকে আর কোনদিন মনিরা রহমানকে ছোট সর্দার বলে ডাকতে আপত্তি করতে পারেনি।

নূর রহমানের হাত থেকে খাবার আর খেলনা হাতে নিলো। মনিরা বললো– যাও বাবা, দাদীমার কাছে যাও।

নূর খুসী হয়ে চলে গেলো উপরে।

মনিরা স্থির হয়ে দাঁড়ালো, দৃষ্টি রইলো রহমানের মুখে।

বললো রহমান– বৌ রাণী, কি হয়েছে আপনাদের?

আমাদের?

হাঁ সর্দারকে আমরা ফিরে পেয়েছি বটে, কিন্তু তার আসল রূপ কোথায় অন্তর্ধান হয়েছে। সব সময় গম্ভীর ভাবাপন্ন। কি হয়েছে বৌ-রাণী?

মনিরা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো– জানিনা।

না, আপনাকে বলতেই হবে?

আমি বললাম জানিনা।

বৌ-রাণী, আমার কাছে আপনি কোন কথা গোপন করবেন না। জানেন তো, সর্দার আমাদের সর্বস্ব। তার বিষন্ন মলিন ভাব আমাদের মনে অহঃরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। বলুন বৌ-রাণী , কি হয়েছে?

তোমরাই কি শুধু তাকে ভালবাসো, আমি কি তাকে একটুও ভালবাসি না? সিপাহী, আমি–আমিও কম মনঃকষ্ট ভোগ করছিনা। আমার হৃদয়েও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, ------ আজ ক'দিন আমি এতটুকু শান্তি পাইনি। এতটুকু না। সিপাহী, আমি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছি --- গলা ধরে আসে মনিরার।

রহমান নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার চোখ তুলে তাকালো সে মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা বলে চললো– আমিই অপরাধী। আমিই অপরাধী সিপাহী। আমি তাকে ভুল বুঝে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছি....

এবার বললো রহমান– বৌ-রাণী, সর্দার বড় জেদী মানুষ। এক বার অভিমান হলে সহজে তাকে খুশি করা মুসকিল। আমি তাকে অনেক করে বলেছি, আপনার এখানে আসার জন্য অনেক অনুরোধ করেছি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো মনিরা, তারপর বললো– আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে যেতে পারো?

সর্দারের কাছে!

হাঁ সিপাহী, তার কাছে একবার আমি যেতে চাই।

কিন্তু ....

না না, কিন্তু নয়, তুমি আমাকে তার কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দাও সিপাহী! নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।

বৌ-রাণী

জানো– নারীর স্বামী না হলে সে জীবনের কোন দাম নেই। স্বামীই যে সব। আমি ভুল করেছি রহমান, আমি ভুল করেছি।

তাহলে আপনি.......

হাঁ, আমাকে যেমন করে পারো একবার তার কাছে নিয়ে চলো।

আস্তানায় যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় বৌ-রাণী। একটু চিন্তা করে বললো রহমান– আজ সর্দার ব্যস্ত থাকবেন। এর পর যেদিন সুযোগ আসবে আপনাকে আমি সর্দারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবো।

সিপাহী।

বৌ-রাণী, আপনি আমার উপর ভরসা রাখবেন, সর্দারের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবেই।

সিপাহী।

চলি বৌ-রাণী।

এসো সিপাহী!

রহমান পুনরায় মনিরাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে– খোদা হাফেজ।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে– খোদা হাফেজ।

বেরিয়ে যায় রহমান।

মনিরা তাকিয়ে থাকে রহমানের চলে যাওয়া পথের দিকে।

ছাদের উপরে তখন মরিয়ম বেগম আর নূরের আনন্দ ভরা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

❑

হোটেল গুল বাগের সম্মুখে এসে একটা গাড়ি থামলো। গাড়ি থেমে নেমে এলো দুটি যুবক। শরীরে তাদের মূল্যবান কোট প্যান্ট-টাই। প্রথম যুবকের চোখে কালো চশমা।

যুবকদ্বয় হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করতেই একজন বয় এগিয়ে এলো।

প্রথম যুবক একটা কার্ড হাতে দিয়ে বললো– মিস পারভিনকে দাও।

কার্ড হাতে বয় চলে গেলো।

যুবকদ্বয় নিম্ন স্বরে কিছু আলাপ করতে লাগলো।

বয়ের বিলম্ব দেখে প্রথম যুবক একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। সিগারেট থেকে ধূম নির্গত করতে করতে হোটেল-কক্ষের চারদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো সে।

এমন সময় পারভিন এসে দাঁড়ালো তাদের সম্মুখে।

প্রথম যুবককে দেখতে পেয়ে আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো, উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললো– হ্যালো, আপনি! আসুন আমার সঙ্গে।

যুবকদ্বয় অন্য কেহ নয়, প্রথম জন দস্যু বনহুর দ্বিতীয় জন তার প্রধান অনুচর রহমান।

বনহুর আর রহমান অনুসরণ করলো পারভিনকে।

হোটেল কক্ষ হলেও এটা পারভিনের নিজস্ব কক্ষ।

সুন্দরভাবে সজ্জিত এ কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর বললো– মিস পারভিন, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম।

মোটেই আমি বিরক্ত হইনি, আপনারা বসুন।

বনহুর চোখের চমশাটা খুলে টেবিলে রাখলো, তারপর আসন গ্রহণ করলো।

রহমান যদিও কোনদিন প্রভুর সম্মুখে আসন গ্রহণ করে নাই, আজ তার ইংগিতে আসন গ্রহণ করলো।

পারভিনের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। সেদিনের পর পারভিন মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি প্লেনের সেই যুবকটিকে। তার পর ছবিতে যখন তাকেই সে দেখলো তখন আরও মুগ্ধ হলো। শয়নে–স্বপনে জাগরণে-সব সময় ঐ মুখানা ভাসছিলো তার মানস পটে। এই ক্ষণে তার কামনার জনকে পেয়ে কি যে আনন্দ হলো! –পারভিন যেন আত্মহারা হয়ে পড়লো।

পারভিন আসন গ্রহণ করতেই বললো বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বন্ধু, তোমার সঙ্গে এর পরিচয় নেই। ইনি গুলবাগ হোটেলের মালিক মহব্বৎ আলীর কন্যা মিস পারভিন আর এ আমার বন্ধু রহমান।

পারভিন হেসে বললো– আপনার পরিচয় আজও কিন্তু আপনি বলেননি। আপনি কি 'কুন্তি বাঈ' ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

হাঁ, আপনার অনুমান সত্যি। আমিই মুকছুদ চৌধুরী।

আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যি, আপনার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

খুশি হলাম শুনে।

আপনি নিশ্চয়ই ছবিটা দেখেছেন মিঃ চৌধুরী।

না, সে সুযোগ এখনও আমার হয়নি।

সে কি?

হাঁ মিস পারভিন, সুটিং শেষ করেই আমাকে বিদায় নিতে হয়েছিলো।

বনহুর, রহমান আর পারভিন যখন হোটেল-কক্ষে বসে আলাপ করছিলো তখন হোটেলে একটা হট্টগোল শোনা গেলো।

অল্পক্ষণ পর একটা বয় ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করে পারভিনকে লক্ষ্য করে বললো– আপা, আপ্ কা লকেট মিল গিয়া।

পারভিন অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো– লকেট পাওয়া গেছে। পর মুহূর্তে পারভিন বললো– আপনারা কয়েক মিনিটের জন্য বসুন এক্ষুনি আসছি।

'আপ্ কো লকেট মিল গিয়া' কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলো বনহুর। পারভিনের কথায় বললো– আচ্ছা, আসুন।

বেরিয়ে গেলো পারভিন।

বনহুর রহমানের কানে মুখ নিয়ে বললো– রহমান, আর একটা বিভ্রাট ঘটলো।

বিভ্রাটঃ

হাঁ, পারভিনের লকেট আমিই নিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিন পথে একটা বৃদ্ধ ভিখারীকে দিয়েছিলাম ওটা, ভুল করেই ওটা আমি দিয়েছিলাম...... কারণ, আমার পকেটে তখন ঐ লকেট ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেল থেকে ভেসে এলো এক বৃদ্ধের ব্যথা কাতর কণ্ঠস্বর— মায় নেহি জানতা, কাওন আদমী মেরে হাত মে ও চীজ দিয়া....

সঙ্গে সঙ্গে শুনা গেলো কর্কশ কণ্ঠে– শালা বদমাশ বুড়হে, তুম লকেট বেচনে গিয়া, আর লকেট তুম চোরায়ে নেহি?

বুড়োকে আঘাতের শব্দ ভেসে এলো সেই সঙ্গে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

রহমান উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে ফিরে এলো– সর্দার, কয়েকজন পুলিশ একটা বৃদ্ধকে প্রহার করছে।

বনহুর পা বাড়ালো দরজার দিকে।

রহমান বললো– সর্দার, ঠিক হবে না আপনার যাওয়া, বরং বৃদ্ধকে মুক্তির উপায় করতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পদশব্দ শোনা যায়।

বনহুর আর রহমান আসন গ্রহণ করে।

বনহুর সিগারেট কেসটা বের করে উল্টে পাল্টে নাড়াচাড়া করতে থাকে, নিজকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে সে।

পারভিন কক্ষে প্রবেশ করে আনন্দ ভরা গলায় বলে উঠে– মিঃ চৌধুরী, আমার লকেট ফিরে পেয়েছি। এই দেখুন।

বনহুরের সম্মুখে মেলে ধরে পারভিন লকেটখানা।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন– এ লকেটখানাই বুঝি প্লেনের মধ্যে আপনি হারিয়ে ছিলেন মিস পারভিন?

হ্যাঁ, সত্যি আমার লকেটখানা কি করে যে বুড়োটা পেয়েছিলো সেই জানে। নিশ্চয়ই সে চুরি করেছিলো ওটা।

বলে বনহুর–বুড়োটা কি সেদিন প্লেনে ছিলো?

ছিলো না কিন্তু– একটু চিন্তা করে বলে উঠলো পারভিন– হয়তো লোকটা আদতে বুড়ো মানুষ নয়, কোন চোর।

তখনও বাইরে থেকে বুড়োর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে– মায় নেহি জানতা বাবুজী...... মায় নেহি জানতা...

পুলিশের কণ্ঠস্বর—হাজত মে ভরনে ছে তুম ঠিক হোগা, নেহি তো সাচ বাত বোলো।

পুলিশের হান্টারের আঘাত গিয়ে পড়লো বৃদ্ধের কোঁকড়ানো পিঠে!

অমনি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ–খোদা তু দেখ্ মেরা কিয়া কসুর ....

একটা হাসির শব্দ শোনা গেলো, অট্টহাসির শব্দ। গোটা হোটেলটা যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠলো, হাসি বন্ধ করে বললো লোকটা– তুমহারি জান নেকাল লেঙ্গে। মেরা নাম মহব্বৎ আলী – হাঃ হাঃ হাঃ বুড়হে, তুম মেরা পারভিনকা লকেট লিয়া–

নেহি নেহি হাম নেহি–

বনহুর অধর দংশন করতে লাগলো।

পারভিন বনহুরের মনোভাব বুঝতে পেরে উৎকণ্ঠিত হলো। বললো রহমান– আজ আমাদের আর এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিলো যে?

বনহুর আনমনা ভাবে উঠে দাঁড়ালো –মিস পারভিন, চলি, গুডবাই।

পারভিন কিছু বলার পূর্বেই বেরিয়ে গেলো বনহুর আর রহমান।

❑

বনহুর ড্রাইভ্ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

রহমান বললো– সর্দার, মহব্বৎ আলীকে চিনেছেন?

হাঁ রহমান, কিন্তু তার পূর্বে চিন্তা বৃদ্ধ ভিখারীকে বাঁচিয়ে নেওয়া। কি করে ওকে বাঁচানো যায়!

আমি সে কথাই ভাবছি। দেখ রহমান, এ বৃদ্ধের পরাভোগের জন্য দায়ী আমি। আমিই দায়ী!

আপনিতো ওর অমঙ্গল চিন্তা করে ওটা দেননি!

কিন্তু বেচারী– কথা শেষ না করে বনহুর হোটেল ছেড়ে কিছুটা দূরে একটা গলির মধ্যে গাড়ি রাখলো। প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অল্পক্ষণ পরে দুজন পুলিশ আর দুজন লোক– বোধহয় একজন কোন স্বর্ণকার, দ্বিতীয় জন হোটেলের কোন ব্যক্তি। সঙ্গে বৃদ্ধ ভিখারী। ভিক্ষারীর হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি– পুলিশদ্বয় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে বৃদ্ধ ভিখারীটিকে।

যেমন গলির পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো, আর ঠিক সে মুহূর্তে বনহুর ঝাপিয়ে পড়লো পুলিশদের উপর।

রহমানও প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করলো।

এক এক মুষ্টিঘাতে এক একজনকে ধরাশায়ী করলো বনহুর ও রহমান।

পুলিশ রাইফেল তুলে ধরবার মত অবসর পেলো না।

বনহুর আর রহমান বৃদ্ধ ভিখারীকে মুক্ত করে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হলো গাড়ি নিয়ে।

পুলিশ ও লোক দু'জন শরীরের ধূলো ঝেড়ে ছুটলো কেউ পুলিশ অফিসে, কেউ হোটেল গুলবাগে।

❑

বেটা, তুম্ কাওন? বৃদ্ধ কুঁকড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে সোজা হয়ে বসলো। চোখে-মুখে তার কৃতজ্ঞতার ছাপ।

বনহুর বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো।

রহমান বৃদ্ধের হাত এবং কোমরের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে বললো – তুম্ ডাকু বনহুরকে সামনে।

কিয়া? বৃদ্ধের চোখে মুখে একটা বিস্ময় ভাব ফুটে উঠলো। আনন্দ বিচলিত গলায় বললো বৃদ্ধ– ডাকু বনহুর, মুঝে খালাস কিয়া?

হাঁ, আব উসিকে পাশ রাহোগে, তুমহারা খানা পিনা কই তকলিফ নেহি হোগি।

বাপুজী সাচ?

হাঁ, সাঁচ।

এবার বৃদ্ধ রহমানের মুখে তাকিয়ে বললো– খোদা তেরি ভালা করে।

রহমান বললো এবার– বাবা, হাম নেহি ডাকু বনহুর। তুম্ হারা সামনে খাড়া অহি আদমী–

তুম্! আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখায় বৃদ্ধ।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে– হাঁ, বাবা। মুঝে তুম্ মাফ করদো। লকেট তুমহে মায় দিয়া থা।

তুম্ মুঝে লকেট দিয়াথা?

হাঁ, হাম্ ভুল কিয়া। তুম মুঝে মাফ করদো বাবা?

খোদা তুঝে মাফ কিয়া বেটে।

সেদিনের পর থেকে বৃদ্ধ ভিখারী বনহুরের আস্তানায় স্থান লাভ করলো।

বনহুর জানে, এর পর বৃদ্ধকে শহরের পথে দেখলে কোন পুলিশ তাকে ক্ষমা করবেনা। নিরপরাধ ভিখারী কেনো কষ্ট পাবে। তার চেয়ে তার আস্তানায় থাকাই শ্রেয়।

বৃদ্ধ ভিখারী হলেও দরবেশ ধরণের লোক ছিলো। বনহুরের দয়ায় আর তাকে ভিক্ষার জন্য চিন্তা করতে হয় না, এখানে খায়-দায়, গজল গান গায়, আর খোদার এবাদত করে।

বৃদ্ধকে ভালই লাগে বনহুরের, মাঝে মাঝে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসে বনহুর– নানা রকম ধর্ম আলোচনা করে সে।

বৃদ্ধ যখন গজল গায় তখন বনহুর তন্ময় হয়ে শোনে, মন প্রাণ ভরে উঠে অনাবিল এক আনন্দে।

একদিন বৃদ্ধ নির্জন স্থানে বসে গজল গাইছিলো। জ্যোছনা রাত, অদূরে নির্ঝরিনী ঝর্ণাধারা ছল ছল শব্দ করে বয়ে চলেছে। আপন মনে গজল গাইছিলো বৃদ্ধ দু'চোখ তার মুদিত।

অদূরে একটা পাথরাসনে বসে দস্যু বনহুর।

অন্য একটা পাথরে ঠেস দিয়ে সেও দু'চোখ বন্ধ করে ছিলো। জ্যোছনার আলোতে বনহুরকে দেব কুমারের মত সুন্দর লাগছিলো। শরীরে তার শুভ্র পোশাক।

বনানী ঢাকা পাথরাসনে পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোছনার আলো খেলা করছিলো; খানিকটা জ্যোছনার আলো এসে পড়ছিলো বনহুরের চোখে-মুখে। তন্ময় হয়ে শুনছিলো বনহুর বৃদ্ধের গজল গান।

এমন সময় অদূরে একটি নারীমূর্তি এগিয়ে আসে, পাশে একটি লোক। গাছের ছায়ায় আধো অন্ধকারে অতি লঘু পদক্ষেপে এগুচ্ছিলো তারা।

পুরুষ লোকটি এবার বললো– বৌ-রাণী, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি বাবাজীকে আস্তানায় নিয়ে যাই। তারপর আপনি ....

নারীমূর্তি অন্য কেহ নয়, দস্যু বনহুরের পত্নী মনিরা।

পুরুষ ব্যক্তিটি রহমান।

রহমানের কথা বললো মনিরা– যাও সিপাহী, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

এখানে আপনি একা থাকবেন বৌ-রাণী? কোন জীব ......

ভয় নেই সিপাহী, হতভাগিকে কেউ খাবেনা। তুমি যাও।

মনিরা দাঁড়িয়ে পড়লো।

রহমান চলে গেলো সম্মুখের দিকে।

বৃদ্ধের গজল প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো।

রহমান বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধের গজল শেষ হলে বললো– সর্দার!

বনহুর যেমন বসেছিলো তেমনি বসে রইলো, বললো– বসো রহমান।

আজকাল মাঝে মাঝে বনহুর রহমানকে নিয়ে এই নির্জন ঝর্ণার ধারে এসে বসতো, কাজেই আজও বললো তাকে বসতে।

রহমান অন্যদিন হলে বসে পড়তো নীচের কোন পাথরখণ্ডে। আজ বসলোনা, বললো রহমান –বাবাজীর শরীর আজ ভাল নয়, ওকে আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

আচ্ছা যাও।

রহমান একবার বৃদ্ধের পাশে এসে বললো– বাবাজী, আভি তুম চলো। রাত বহুৎ হুয়ে......

আচ্ছা, চলো বাপু।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো।

রহমান বৃদ্ধের হাত ধরে নিয়ে চললো বনপথ ধরে।

বনহুর আবার পাথরখণ্ডে ঠেস দিয়ে ভাল হয়ে বসলো। বনানী ঢাকা ঝর্ণার ধারে ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় আজ তার বড় ভাল লাগছে। আজ সে কোথাও যায়নি, অবশ্য রহমানের বিশেষ অনুরোধেই সে রয়ে গেছে। আগামীকাল মহব্বৎ আলীর হোটেলে আবার সে পদার্পণ করবে। কাল কি করতে হবে- রহমানের সঙ্গে এ নিয়েই আলোচনা হবে এখানে। রহমান বৃদ্ধকে আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে, সেজন্য বনহুর অপেক্ষা করছে এখানে।

কোমল একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলো বনহুর নিজের মাথার চুলে।

বনহুর চোখ মেলে তাকিয়ে চমকে উঠলো- কে তুমি?

ঘোমটায় মনিরা মুখটা অর্দ্ধেক ঢেকে রেখেছিলো, বনহুরের কণ্ঠস্বরে বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠলো। একটু সরে দাঁড়িয়ে রইলো, কোন কথা বললোনা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো বিদ্যুৎ গতিতে; গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো কে? এক ঝট্‌কায় মনিরার মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিলো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনার এক খণ্ড আলো এসে পড়লো মনিরার মুখে। বনহুর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো- তুমি!

মনিরা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের পা দু'খানা— ওগো, আমায় তুমি মাফ করে দাও। মাফ করে দাও ......

পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো বনহুর, কোন কথা বললোনা। মুখমণ্ডল কঠিন, দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো।

মনিরার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠলো বনহুরের পা দুখানা

তবু নীরব বনহুর।

সেদিন মনিরার উপেক্ষা বনহুরের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছিলো। জীবনে সে বুঝি এতোবড় আঘাত আর কোনদিন পায়নি।

মনিরার হাতের মধ্য হতে পা দু'খানা সরিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো বনহুর, কঠিন কণ্ঠে বললো- রহমান তোমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে বুঝি? এর জন্য ওকে শাস্তি পেতে হবে।

না না, ওর কোন দোষ নেই, আমি- আমিই এসেছি। আমাকে তুমি মাফ করো। যে ভুল আমি করেছি সেদিন, তার জন্য অহঃরহ আমি জ্বলে মরছি। আমাকে তুমি মাফ করো ....

আর কোনদিন বিরক্ত করবোনা তোমাকে মনিরা।

এ তুমি কি বলছো? মনিরা অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠে দাঁড়ালো।

হাতের মধ্যে হাত রগড়ে আবার বললো– তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারিনা। আমাকে তুমি হত্যা করো ....

বনহুর রাগত কণ্ঠে বললো—তুমি তো বেশ ছিলে, বরং আমার উপস্থিতি তোমাকে বিরক্ত করে তুলেছিলো ...

উঃ আজও তুমি মনে রেখেছো সব কথা? তুমি বিশ্বাস করো, ওগুলো আমার মনের কথা নয়........ তুমি বিশ্বাস করো....

মনিরা বনহুরের হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরলো।

বনহুর তখনও নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখমণ্ডল গম্ভীর কঠিন। মনিরার অশ্রু যে তাকে বিচলিত করেনি তা নয়, এর চেয়ে আরও কত কঠিন কথা মনিরা বনহুরকে বলেছে কতদিন, কিন্তু সেদিনের কথাগুলো বনহুরের মনে তীরফলকের মতই বিদ্ধ হয়ে আছে যেন।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা ঠুকতে লাগলো– তুমি বিশ্বাস করো, ও আমার মনের কথা নয় .... ও আমার মনের কথা নয় ...

বনহুর তখনও স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

মনিরার বিলাপধ্বনি ওর কানে পৌঁছোচ্ছে কিনা কে জানে।

হঠাৎ মনিরা ছুটে চললো ঝর্ণার দিকে, যাবার সময় বললো মনিরা– বেশ, ক্ষমা না করতে পারো, এ জীবন আমি বিসর্জন দেবো, তবু ফিরে যাবো না।

মনিরা ছুটে গিয়ে ঝর্ণার পাশে দাঁড়ালো।

বনহুর আর নিজকে সংযত রাখতে পারলো না, উচ্চ কণ্ঠে বললো– মনিরা শোন।

অভিমানে মনিরার বুক ভরে উঠেছে, এ মুহূর্তে সে নিজ জীবন বিসর্জন করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। ঝাপিয়ে পড়বে মনিরা কিন্তু আর পারলো না, বনহুরের কণ্ঠস্বর তার কানে যেন মধু বর্ষণ করলো। থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

বনহুর ততক্ষণে মনিরার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনিরা, এবার লুটিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে।

বনহুর ভুলে যায় যত অভিমান।

❑

রাত যত বেড়ে আসে নূরী ততই বনহুরের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বনহুর আজ বাইরে কোথাও যায়নি জানে সে। আস্তানার আশেপাশে কোথাও আছে কিংবা বৃদ্ধের গজল শুনছে সে ঝর্ণার পাশে বসে। কিন্তু এতোক্ষণে ও ফিরে আসছেনা কেনো। নূরী আস্তানার বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই রহমান পথ রোধ করে দাঁড়ালো– কোথায় যাচ্ছো?

নূরী গম্ভীর কণ্ঠে বললো– বনহুরের সন্ধানে। পথ ছেড়ে দাও।

না, পথ ছাড়বোনা।

কেনো?

সর্দার ওদিকে নেই।

হাঁ, আমি শুনলাম, সে ঝর্ণার পাশে বসে বাবাজীর গজল শুনছিলো।

কে বললো তোমাকে?

কায়েস।

ও জানেনা।

আমি বাবাজীর কাছে শুনে আসছি, দাঁড়াও।

নূরী চলে গেলো বাবাজীর কক্ষের দিকে।

বৃদ্ধ তখন শোবার আয়োজন করছিলো।

নূরী প্রবেশ করলো সেখানে।

রহমান চিন্তিত হলো এবার। সর্দার ঝর্ণার ধারেই আছে, এবং সে একা নেই–তার পাশে আছে বৌ-রাণী।

নূরী কক্ষে প্রবেশ করতেই বললো বৃদ্ধ– কাওন্?

নূরী।

তুম্ এত্না রাত পর এঁহা?

এক বাত্ কইয়ে বাবাজী?

বোলো?

সর্দার কাঁহা তুম্ জানতে হো বাবাজী?

হাঁ মায় জানতা হু, সর্দার বেটা ওহি ঝর্ণাকে কিনারে।

রহমান যেন হাবা বনে গেলো।

নূরী রহমানের মুখে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো– এতো মিথ্যা বলতে পারো তুমি রহমান!

নূরী যেওনা। আমিই সর্দারকে ডেকে আনছি।

না, আমিই যাবো।

এতো রাতে সর্দার তোমাকে ওখানে দেখলে খুশি হবে না।

কিসে সে খুশি হবে না হবে শুনতে চাইনা রহমান।

একাই যাবে?

যদি মনে করো এসো আমার সঙ্গে। নূরী কথা শেষ করে এগিয়ে চললো।

এদিকে নূরী আর রহমান যখন বনপথ ধরে এগিয়ে আসছে, তখন বনহুর আর মনিরা উঠে দাঁড়িয়েছে। বললো বনহুর– চলো মনিরা, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মনিরা আর বনহুর এগুলো, অদূরে একটা গাছের সঙ্গে বাধা ছিলো তাজ।

বনহুর মনিরাকে তাজের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও বসলো। মনিরা স্বামীর বুকে নিবিড় ভাবে ঠেস দিয়ে বললো– আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এই তো আমার বেহেস্ত।

বনহুর মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর তাজের লাগাম টেনে ধরলো।

ধমকে দাঁড়ালো নূরী, তাজের খুঁড়ের শব্দ তার অতি পরিচিত। বললো নূরী– রহমান, তাজের পদশব্দ না?

রহমান মনে মনে হাজার শুকরিয়া করে বললো– সর্দার বুঝি শহরে গেলো।

শহরে?

হাঁ, কাজ আছে সেখানে।

কই, তুমি তো গেলেনা?

সর্দারের গোপন কাজ কিনা।

তুমি জানো রহমান, কোথায় গেলো সে?

না নূরী, আমি জানিনা।

ঐ চৌধুরী বাড়ি গেলো না তো?

রহমান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললো– নূরী, অনেক দিন বলেছি, আজও বলছি– মিছামিছি সর্দারের পথ চেয়ে কোন ফল হবে না।

নূরী মুখ গম্ভীর করে ফেললো, বললো– রহমান, আমি যে তারই কাঙ্গাল।

কিন্তু সে যদি তোমাকে কোনদিন ....

চিরদিন আমি তার পথ চেয়ে থাকবো।

জীবনটা নষ্ট করে দিবে নূরী?

না না, আমার জীবন নষ্ট হবার নয়, আমার হুর– সেই তো আমার সব।

কিন্তু ...

না, কিন্তু নয় রহমান। হুর আমার, আমি তার----- আমি তার---- আনমনা হয়ে যায় নূরী!

রহমান অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছে নেয়।

বলে রহমান– চলো নূরী।

চলো–

নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করে শয্যা গ্রহণ করে, কিন্তু মন তার চলে গেছে দূরে বহু দূরে সুদূর অতীতে--- বনহুরের সঙ্গে ছোট বেলার স্মৃতিগুলো হাতড়ে চলে একটির পর একটি করে। ছোট বেলায় দু'জনে বনে বনে লুকোচুরি খেলা। তীর ধুন নিয়ে শিকার করা। নদীতে দু'জনে মিলে সাঁতার কাটা। নূরী পাথরখণ্ডে বসে বাঁশি বাজাতো, বনহুর চুপি চুপি পিছন থেকে এসে চোখ দু'টো টিপে ধরতো ওর। দু'জনে হাসতো খিল খিল করে। কত দিন বন থেকে ফুল তুলে নিয়ে গুজে দিয়েছে বনহুর নূরীর খোপায়--- এসব কি ভুলবার। শুধু আজ নয়, যেদিন নূরীর চোখে ঘুম আসতো না বা কোন চিন্তার বেড়াজাল তাকে জড়িয়ে ধরতো সে দিন নূরীর মনের পর্দায় ভেসে উঠতো ছোট বেলায় তার আর বনহুরের স্মৃতিগুলো।

❑

জানো আর একজন আছে এ কক্ষে? বললো মনিরা।

বনহুর তাকালো কক্ষের চারদিকে, কোথাও কাউকে না দেখে বললো– মশারীর নীচে তো?

হাঁ। বলতো কে?

তোমার নূর।

কি করে জানলে তুমি?

রহমান সব বলেছে।

এসো নূরকে দেখো। মনিরা বনহুরের দক্ষিণ হাত ধরে নিয়ে আসে খাটের পাশে। মশারী উচু করে বলে মনিরা চিনতে পারছো?

নূর পাশ ফিরে এদিকে মুখ করে শুয়ে ছিলো। হাত-ছোট গেঞ্জি গায়ে- দক্ষিণ হাতখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাতের বাজুতে সেই চিহ্ন।

বৈদ্যুতিক আলোতে স্পষ্ট দেখলো বনহুর নূরকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো। এ শিশুকেই একদিন সে কাপালিক সন্ন্যাসীর কবল থেকে রক্ষা করে নূরীর কোলে অর্পণ করেছিলো। যদিও কয়েক বছরের ব্যবধান ঘটেছে, তবু বনহুর চিনতে পারে নূরকে। বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে অতীতের কয়েকটা ছবি। নূরী শিশুকে কোলে করে খুসীতে আত্মহারা, বলে - হুর, জানো এর নাম রেখেছি মনি! চমকে উঠেছিলো বনহুর, কারণ, তার মা তাকে ঐ নাম ধরে ডাকতো। বড্ড অপেয়া নাম ওটা- বলেছিলো বনহুর। নূরী খোকনের গালে-মুখে চুমো দিয়ে ভরে দিয়েছিলো- তারপর আর একদিন নূরী খোকনটিকে কোলে করে প্রবেশ করেছিলো তার কক্ষে। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলেছিল- দেখো দেখো হুর, তোমার দক্ষিণ বাহুর মত আমার মনির হাতেও একটা চিহ্ন। ---- আজ বনহুরের চোখের সম্মুখে সবগুলো দৃশ্য একের পর এক ফুটে উঠতে লাগলো। নূরীর মনিই মনিরার নূর! আশ্চর্য!

বললো মনিরা- কি ভাবছো?

উঁ।

কি ভাবছো?

নূরকে তুমি কোথায় পেলে মনিরা?

শুনবে, শুনবে তুমি সে কাহিনী?

হাঁ বলো, শুনবো।

বসো।

পাশাপাশি বসলো মনিরা আর বনহুর। মনিরা কিভাবে নূরকে পেয়েছে, সব কথা খুলে বললো বনহুরের কাছে।

অবাক হয়ে সব শুনলো বনহুর, এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো– এ শিশুই সেই মনি, যার জন্য নূরী দিন রাত অশ্রু বিসর্জন করেছে।

মনিরা যখন সব বলছিলো, তখন বনহুর চিন্তা করেছিলো, নূরীর কাছে কথা দিয়েছে– সে তার মনিকে এনে দেবে।

বনহুরের মনে নতুন এক অভিসন্ধি উঁকি দিয়ে যায়।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলে– নূরকে আদর করলেনা তো?

আনমনা হয়ে পড়েছিলো বনহুর, বললো– ঘুমুচ্ছে– ঘুমুতে দাও।

বললো মনিরা– সত্যি আমার নূর তোমারই প্রতিচ্ছবি। ওকে নিয়েই আমি বেঁচে আছি।

বনহুরের কানের কাছে ভেসে উঠে নূরীর করুণ কণ্ঠস্বর– মনি যে আমার জীবন। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা।–

বনহুর যখন চিন্তা করছিলো নূরীর কথা তখন মনিরা হেসে বললো– একটা কথা বলবো তোমাকে রাখবে?

রাখবো, বলো?

সত্যি?

হাঁ।

মতি মহল হলে ভাল একটা ছবি হচ্ছে, আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে?

চমকে উঠলো বনহুর, জানে সে মতি মহল হলে এখন 'কুন্তি বাঈ' ছবি চলছে। যদিও সে ছবিটা এখনও দেখেনি কিন্তু শুনেছে এবং পথে স্থানে স্থানে পোষ্টার নজরে পড়েছে। আরও শুনেছে বনহুর—পুলিশ মহলে ভীষণ ভাবে আলোড়ন শুরু হয়েছে। কুন্তিবাঈ ছবির হিরোকে তারা চিনতে পেরেছে এবং এ নিয়ে পুলিশ মহল বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছে।

কথাটা জনগণের কানে এখনও পৌছেনি, দস্যু বনহুরকে তারা কোনদিন চোখেও দেখেনি, কাজেই তারা কোন রকম দ্বিধা না করে ছবির হিরোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে।

মনিরার কথায় বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়লো, বললো– সে– মনিরা, এ ছবি নাই বা দেখলে।

অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে মনিরা– কেনো, এ ছবি দেখতে তোমার আপত্তি কিসে?

না, আপত্তি ঠিক নয়– তবে শুনেছি, এ ছবি নেহাত মন্দ।

মানে আমার দেখার অনুপযোগি, এইতো? কিন্তু তুমি যতই বলো, ছবিটা আমি দেখবো–তুমি নিয়ে যাবেনা আমাকে?

এতোই যদি সখ তাহলে আমার সঙ্গে না গিয়ে আর কারো সঙ্গে যাও।

উঁ হুঁ, তোমার সঙ্গে কোনদিন ছবি দেখিনি।

আমাকে তুমি বিপদে ফেলতে চাও?

তোমার বিপদ সে তো আমার মাথায় বজ্রাঘাত–

তবে কেনো জেদ করছো মনিরা?

বড় সখ এ ছবি তোমাকে সঙ্গে করে দেখবো।

বেশ। গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

মনিরা খুশি হলো–সত্যি তো? কথা দিলে?

দিলাম।

এর পর বিদায় চাইলো বনহুর মনিরার কাছে।

আজ মনিরা খুশি মনে বিদায় দিলো বনহুরকে।

❑

নূরের গায়ের উপর হাত রেখে ঘুমিয়ে আছে মনিরা।

আজ মনিরার মুখে নেই কোন বিষাদের কালো ছায়া। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখে ঘুমিয়ে আছে সে। স্বামীর চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো মনিরা।

এমন সময় পিছনের জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো সে মনিরা আর নূরের বিছানার পাশে।

আজ শরীরে বনহুরের দস্যু ড্রেস।

জমকালো পোশাকে দেহ আচ্ছাদিত। মাথায় কালো পাগড়ি মুখে গালপট্টি বাধা। পায়ের জুতোও জমকালো পালিশ করা।

বনহুর মনিরার শিয়রে এসে দাঁড়ালো।

প্যান্টের পকেট থেকে বের করলো একটা রুমাল। রুমালখানা ধীরে ধীরে মনিরার নাকের কাছে ধরলো, তারপর নূরের নাকে।

এবার রুমালখানা পকেটে রেখে নূরের দেহের উপর থেকে মনিরার হাতখানা আলগোছে সরিয়ে ফেললো বনহুর। তারপর দ্রুত নূরকে তুলে নিলো কোলে।

মনিরার দেহের চাদরখানা সরে গিয়েছিলো ফেললো এক পাশে।

বনহুর বাম বাহুতে নূরকে বুকের সঙ্গে এটে ধরে, দক্ষিণ হস্তে মনিরার গায়ে চাদরখানা টেনে দিলো। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

চৌধুরী বাড়ির অদূরে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলো তাজ।

বনহুর নূরকে নিয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো , কৌশলে উঠে বসলো তাজের পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ ছুটতে শুরু করলো।

সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে বনহুর নূরকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শহর ছেড়ে গ্রামের পথ ধরে এগুচ্ছে বনহুর– তারপর বনাঞ্চল।

আস্তানায় পৌছতে প্রায় ভোর হয়ে এলো বনহুরের।

নূরী তখনও ঘুম থেকে উঠেনি। বনহুর প্রবেশ করলো নূরীর কক্ষে, ধীরে ধীরে নূরকে শুইয়ে দিলো নূরীর পাশে।

জেগে উঠলো নূরী, চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্মিত হলো– তুমি! সঙ্গে সঙ্গে পাশে নজর পড়তেই আশ্চর্য কণ্ঠে বললো– এটা কে?

বনহুর হেসে বললো– তোমার মনি।

মনি।

হাঁ।

নূরী উঠে বসে ভাল করে লক্ষ্য করলো– তার মনি যখন হারিয়ে গিয়েছিলো, তখন ছিলো সে ছোট্ট এক রত্তি। এক পা দু'পা করে কেবল হাটতো। আর আজ বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। নূরী তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক করে দেখতে লাগলো– দক্ষিণ হাতের বাজুতে নজর পড়তেই নিসন্দেহ হলো সে। ঘুমন্ত নূরকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো, আদর করে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো ওকে।

বনহুর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

নূরী যখন নূরের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য ভীষণ ভাবে চেষ্টা করছে তখন বললো বনহুর– সময় হলে নিজেই জাগবে। এখন ওকে ঘুমোতে দাও।

নূরী আলগোছে বালিশে শুইয়ে দিয়ে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো নূরের মুখের দিকে।

☐

মনিরার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলো তার শয্যার পাশে মরিয়ম বেগম, সরকার সাহেব, নকীব আরও বাড়ির চাকর-বাকর সবাই অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়ম বেগম বসে আছেন তার শিয়রে, বার বার তিনি আচলে চোখ মুছছেন।

মনিরা চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্মিত হলো। মামীমা, সরকার সাহেব– এরা সব এখানে কেনো! সবাই কাঁদছে – ব্যাপার কি? তবে কি তার কোন অসুখ হয়েছিল? তাই হয়তো হবে, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব।

বললো মনিরা– কি হয়েছে আমার?

ডাক্তার একটু পূর্বে বারণ করে গেছেন– যতক্ষণ রোগি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় ততক্ষণ ওর কাছে কোন রকম কথা বলবেন না। নূরকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে– একথা একেবারে চেপে যাবেন।

ডাক্তারের কথাগুলো স্মরণ করে কোন কথাই বললেন না মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব শুধু বললো– কিছুই হয়নি, তুমি ঘুমোও মা।

মনিরা চোখ বন্ধ করলো বটে কিন্তু ঘুম আর এলো না।

মনিরা সম্পূর্ণ সুস্থ হলো এক সময়।

উঠে বসলো শয্যায়, মামীমাকে ডেকে বললো– আমার কি হয়েছিলো মামীমা?

কিছু হয়নি।

আমার নূরকে দেখছিনা কেনো?

মরিয়ম বেগমের দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসছিলো, অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বললেন– সরকার সাহেব ওকে বাইরে নিয়ে গেছেন।

এ অসময়ে নূরকে পাঠালে কেনো মামীমা?

তুই সুস্থ নস, তাই ও বিরক্ত করবে বলে......মিথ্যা বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিলো মরিয়ম বেগমের– তবু বললেন, না বলে যে কোন উপায় ছিলোনা।

কিন্তু কতক্ষণ ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখবে বা রাখতে পারবে। এদিকে মনিরা পুত্র নূরের জন্য অস্থির হয়ে পড়লো।

মরিয়ম বেগম কি করে বলবেন, রাতে নূরকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। সরকার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এবং তাকেই বললেন কথাটা বলতে।

মনিরা নকীবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো– হারে নকীব, আমার নূর কোথায়? ওকে দেখছিনা কেনো?

নকীব কাঁধের গামছাটায় চোখ মুছে নিয়ে তাকালো এদিক ওদিক, তারপর ফিস ফিস করে বললো নকীব– বলতে মানা করে দিয়েছেন ডাক্তার সাহেব....

নকীবের কথায় মনিরা ভীত হয়ে পড়লো– ওর বলার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই তার নূরের কোন অমঙ্গল ঘটেছে। আর্তকণ্ঠে বললো মনিরা– আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেনো, বল্ বল্ নকীব, আমার নূর কোথায়? কি হয়েছে তার? বল্ বল্.....

নকীবের জামার খানিকটা অংশ চেপে ধরলো মনিরা।

নকীব না বলে আর পারলো না– আপামনি, নূরকে কাল রাত কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

চীৎকার করে উঠলো মনিরা– আমার নূরকে চুরি করে নিয়ে গেছে .....

পাশের কক্ষ থেকে ছুটে এলেন মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব।

মনিরা তখন মাথা ঠুকছে খাটের সঙ্গে, নূর-- নূর-- নূর....আমার নূর--

মরিয়ম বেগম দ্রুত এসে মনিরাকে ধরে ফেললেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– একি করছিস মা? শোন, শোন---

না না, বলো আমার নূর কোথায়, আমার নূর কোথায়। বলো মামীমা, আমার নূর .....

জানিনা মা– কিছুই জানিনা।

বলো মামীমা, আমার নূর কই?

মরিয়ম বেগম বললেন– ভোরে অনেক বেলা হয়ে গেলো তবু তুই দরজা খুলছিস্ না। আমি মনে করলাম, ঘুমোচ্ছিস বুঝি– তাই নকীবকে বললাম তোকে জাগাতে। নকীব তো দরজায় অনেক ডাকা-ডাকি করেও তোকে জাগাতে পারলোনা। শেষ পর্যন্ত আমিও অনেক করে তোকে ডাকলাম, তখনই মনে আমার ভয় আর দুর্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেলো। সেকি, আজ নূরও তো জাগছেনা, ব্যাপার কি হলো! তারপর সরকার সাহেব এলেন, সবাই এলো। দরজা ভেংগে ভিতরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হলাম, তুই একা

বিছানায় অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছিস্ –পাশে নূর নেই। ওদিকে নজর পড়তেই আঁতকে উঠলাম –পিছন শার্সী খোলা।

মনিরা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো– মামীমা, মামীমা আমার নূর তাহলে চুরি হয়ে গেছে! আমার নূরকে কে নিয়ে গেছে, কে নিয়ে গেছে---

গোটাদিন কাঁদা-কাটা করে কাটলো মনিরার। এ বাড়ির সবাই শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লো।

সবাই অনেক করেও মনিরাকে কিছু খাওয়াতে পারলোনা।

সরকার সাহেব থানায় ডায়রী করে দিয়ে এলেন।

থানা অফিসার নতুন লোক, তিনি আশ্বাস দিলেন, নূরকে খুঁজে বের করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এদিকে মনিরা যখন নূরের জন্য উন্মাদিনী প্রায় হয়ে পড়েছে, বনহুরের আস্তানায় তখন নূরী মনিকে নিয়ে মেতে উঠেছে– আনন্দে আজ সে আত্মহারা।

মনি যতই কাঁদছে, আমাল মাল কাছে দাবো– আমার মাল কাছে দাবো--- নূরী ততই এটা-ওটা খেলনা– খাবার দিয়ে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুর আনন্দে আপ্লুত হলো, নূরীর মুখে হাসি ফুটেছে।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় দোল দিতে লাগলো, গান গাইতে লাগলো। ফুলের মালার মুকুট তৈরি করে মাথায়-গলায় পরিয়ে দিতে লাগলো। নূরী মনিকে পেয়ে খুশিতে ডগমগ।

মনি কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদা ভুলে অবাক হয়ে নূরীর কাণ্ড কলাপ দেখতে লাগলো।

সেই ফাঁকে সরে পড়লো বনহুর।

মনিরার হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে বনহুর নূরকে চুরি করে এনেছে। বাপ হয়ে পুত্রকে হরণ করে এনেছে সে মায়ের বুক থেকে। শুধু নূরীকে খুশি করবার জন্যই একাজ করেনি বনহুর, নূরীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার এটা একটা উপায়।

নূরী ভুলে থাকবে তার মনিকে নিয়ে, বনহুরের চলার পথে সে আর বাধার সৃষ্টি করবেনা।

নূরী যখন মনিকে নিয়ে মেতে আছে তখন বনহুর রহমানকে সঙ্গে করে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো।

গোপনে সেখানে রহমান ও তার অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা হলো।

রহমানকে আরও কিছু বললো বনহুর।

রহমান মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

বনহুর একবার নিজের কক্ষে প্রবেশ করে স্বাভাবিক ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো। স্যুট প্যান্ট-টাই, মাথায় ক্যাপ পরে নিলো সে।

রহমান দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো, তার শরীরে সাধারণ ভদ্র ড্রেস।

অদূরে অপেক্ষা করছিলো তাজ আর দুলকি।

বনহুর আর রহমান অশ্বদ্বয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। বনহুর চেপে বসলো তাজের পিঠে, আর দুলকির পিঠে রহমান।

বনবাদর, জঙ্গল-মাঠ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে বনহুর আর রহমান।

বনপথ শেষ হতেই পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মোটরকার।

বনহুর আর রহমান নিকটে পৌঁছতেই ড্রাইভার আসন ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করলো—যে ভদ্রলোকদ্বয় হোটেল গুল বাগে ছিলো, তাদের সরানো হয়েছে?

হাঁ, সরানো হয়েছে।

কিভাবে এ কাজ তোমরা করলে মহসীন?

সর্দার! অনেক কৌশলে তাদের সরিয়েছি, তাদের ড্রাইভারকে সরিয়ে আমি ড্রাইভার সেজে গাড়িতে বসেছিলালাম।

তারপর?

লোক দুজন বাইরের কোন কাজে বেরুবে বলে তখনকার মত গাড়িতে এসে বসলো। আমি জানতাম তারা এ শহরে নতুন—কাজেই পথঘাট তাদের তেমন চেনা নাই। সেই সুযোগ নিয়ে আমি তাদের আমাদের শহরের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছি।

সাবাস! বললো রহমান।

বনহুর বললো- ওদের কোন কষ্ট দাওনি তো?

না সর্দার।

এবার বনহুর আর রহমান গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো মহসীন।

বনহুরের শহরেও একটা গোপন বাড়ি ছিলো। এ বাড়িখানা পূর্বের সেই বাড়িখানার চেয়ে অন্য ধরনের। শহরের প্রায় মাঝামাঝি কতগুলো দোকান-পাট আছে, তারই পিছনে বাড়িটা।

বাড়িখানার আশে-পাশে আরও কতগুলো বাড়ি আছে। সেগুলোতে লোক বসবাস করে। কাজেই এ বাড়িখানা যে দস্যু বনহুরের একটা গোপন আস্তানায়, এটা কেউ সন্দেহ করতে পারে না।

এখানেও বনহুরের কিছু সংখ্যক অনুচর গুপ্তভাবে লুকিয়ে থাকে। অবশ্য একেবারে গোপনভাবে থাকে না, ছদ্মবেশে শহরে তারা ছড়িয়ে থাকে এখানে সেখানে। নানা ভাবে এরা নানা ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সেভাবে কাজ করে তারা।

রহমান এদের দ্বারাই সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে– হোটেল গুলবাগে নানা রকম অনাচার ও দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। শুধু তাহাই নয়, বিদেশি লোকরা এখানে গোপনে নানা রকম ভেজাল ঔষধ পত্র পরিবেশন করে থাকে।

চোরের সঙ্গেই চোরের বন্ধুত্ব, কাজেই যত শয়তান আর দুষ্কর্মকারীর দল এখানে আনাগোনা করে থাকে।

মহসীন ও আর কয়েকজন অনুচর আজ যে লোক দু'টিকে তাদের আস্তানায় আটক করেছে তারা মারাত্মক ঔষধ ব্যবসায়ী। বাইরের দেশ থেকে নানা ধরনের বিষাক্ত ঔষধ এনে এদের হাতে তুলে দেয় এবং প্রচুর অর্থ নিয়ে যায় এরা এসব দেশ থেকে।

কান্দাই শহরে এ ধরনের নানা ব্যবসায়ীর আমদানী হয়ে থাকে গুলবাগ হোটেলে।

আজ দু'জনাকে আটক করতে সমর্থ হয়েছে বনহুরের দল। লোক দু'টির একজনের নাম ডক্টর হংকিং রাও, দ্বিতীয় জন ডক্টর মং লাও। এবার এরা প্রচুর বিষাক্ত এবং ভেজাল ঔষধ এনেছিলো, মহব্বৎ খাঁ এসব ঔষধ রেখেছে। পরে শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে হস্‌পিটাল ও অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রে বহু রোগি এ সব ধরনের ঔষধ সেবনে এবং ইনজেকশানে মৃত্যু বরণ করেছে।

সব সংবাদই বনহুরের কানে এসে পৌঁছেছে।

তাই বনহুর আজ স্বয়ং বের হয়েছে এসব সন্ধানে।

বনহুর আর রহমানের গাড়ি এসে পৌঁছলো তার শহরের গোপন আস্তানায় সম্মুখে।

বনহুর আর রহমান নেমে পড়লো।

অন্তপুরে প্রবেশ করতেই দু'জন রাইফেলধারী অনুচর বনহুরকে অভিবাদন জানালো।

বাড়িটা বাইরে থেকে স্বাভাবিক মনে হলেও ভিতরে স্বাভাবিক ছিলোনা। পর পর কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে একটা খোলা ছোট্ট উঠান– তার পরই আর একটা বড় ঘর। ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। কিছু সংখ্যক বই পুস্তক থরে থরে সাজানো আলমারীতে। এরই একটা আলমারীর পিছনে রয়েছে গুপ্ত সিঁড়ি।

বনহুর আর রহমান সহ মহসীন এই আলমারীটার পাশে এসে একটা স্থানে পা দিয়ে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে আলমারীটা একদিকে সরে গেলো ধীরে ধীরে।

বেরিয়ে এলো সুন্দর একটা সিঁড়ি পথ।

বনহুর আর রহমান এ পথে অগ্রসর হলো। মহসীন পিছনে চললো।

সিঁড়িটা বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত রয়েছে, কোন অসুবিধা হলোনা বনহুর আর রহমানের।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে একটা কক্ষে এসে উপস্থিত হলো তারা। কক্ষটা বেশ বড়, কক্ষ মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। এক পাশে লৌহ শিক পরিবেষ্টিত খানিকটা জায়গা। সে জায়গায় বন্দী রয়েছে দু'জন ভদ্রলোক।

লোক দু'জনের চোখে মুখে দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠেছে। দু'খানা চেয়ারের সঙ্গে লোক দু'জনাকে বেধে রাখা হয়েছে মজবুত করে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো এদের সম্মুখে।

রহমান বললো–সর্দার, এর নাম ডক্টর হংকিং আর ওর নাম মং লও।

বনহুর তীব্র চোখে তাকিয়ে দেখছিলো দু'জনাকে। বললো সে– হুঁ।

মহসীন বললো এবার–সর্দার, এরা শুধু ঔষধের কারবারই করেনা, নিজেদের কোম্পানিতে এরা নানা রকম ভেজাল, বিষাক্ত ঔষধ তৈরি করে।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর– অত্যন্ত লাভকর ব্যবসা।

বনহুর আর রহমানকে দেখে ডক্টর হংকিং রাও আর মং লাও খুশি হয়েছিলো, মনে করেছিলো মহব্বৎ আলীর লোক এরা। পর মুহূর্তে ভীত ভাবে তাকাতে লাগলো ওরা, বনহুর আর রহমানের দিকে।

বনহুর বললো–রহমান, এদের আমার গুম্ ঘরে নিয়ে চলো, সেখানে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করবো।

বনহুর দাঁড়িয়ে রইলো, রহমান ওদিকের একটা সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মেঝেটা দুলে উঠলো । তারপর মেঝেটা সাঁ সাঁ করে নেমে গেলো কয়েক ফিট্ নীচে।

বন্দীদ্বয় এবং রহমান ও বনহুর যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমন রয়েছে। মহসীনও আছে তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে।

বনহুরের আদেশে বন্দীদ্বয়কে লৌহ শিক বেষ্টিত স্থান থেকে বের করে আনা হলো।

বনহুর একটা আসনে উপবেশন করলো।

বন্দীদ্বয় সম্মুখে দন্ডায়মান।

রহমান হাতে তালি দিতেই দুজন বলিষ্ঠ লোক হাজির হলো।

বনহুর ইংগিৎ করতেই বলিষ্ঠ লোক দু'জন ডক্টর হংকিং ও মং লাও এর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। লোক দুটির হস্তে দু'টি সুতীক্ষ্ণ লৌহদন্ড।

বনহুর বললো – ডক্টরদ্বয় , আমি যা জিজ্ঞাস করছি তার সঠিক জবাব দাও , নচেৎ...ঐ লৌহ শলাকা দিয়ে তোমার জিহ্বা ছেদন করা হবে।

ডক্টর হংকিং এর মুখে কোন ভীত ভাব ফুটে না উঠলেও ডক্টর মং লাও এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

বনহুর কিছু ভাববার অবসর না দিয়ে গর্জে উঠলো– মহববৎ আলীর সঙ্গে কত দিন হলো তোমাদের যোগাযোগ?

হংকিং কিছু বলবার পূর্বেই বললো মং লাও–সত্য কথা বললে ছেড়ে দেবেন তো?

বনহুর বললো—নিশ্চয়ই দেবো। আর মিথ্যা বললে ঐ লৌহ শলাকা দিয়ে তোমাদের জিহ্বা ছেদন করবো।

না না, আমাদের জিহ্বা ছেদন করবেন না, সব সত্য কথা বলবো–যা জিজ্ঞাসা করবেন, সব বলবো।

ডক্টর হংকিং রক্তচক্ষু মেলে তাকাতে লাগলো মং লাও এর দিকে। রহমান এবার বললো –জবাব দাও, যা জানতে চাওয়া হলো?

মংলাও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হংকিং বললো –আমাকে বলতে দাও মংলাও।

মং লাও যে কথা বলতে যাচ্ছিলো তা আর বলা হলো না। বললো হংকিং –মহববৎ আলীকে আমরা চিনি না-----

গর্জে উঠলো বনহুর –চেনো না! মহববৎ আলীর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ নেই বলতে চাও----

হাঁ আমি–মানে আমরা তাকে চিনি না। আমরা অন্য কার্য্য উপলক্ষে তার হোটেলে উঠেছিলাম।

বেশ, সেখানে থেকে ফিরে এসে তোমার সত্যতার পুরস্কার দেবো।

বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমান ইঙ্গিত করতেই লৌহ শলাকা হস্তে বলিষ্ঠ লোকদ্বয় বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে হংকিং রাও ও মংলাও বন্দী হলো লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে।

রহমান একটা মেসিনে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা সাঁ সাঁ করে উঠে আসতে লাগলো উপরের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্বের স্থানে মেঝেটা এসে স্থির হলো।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মহসীন কৌশলে লৌহ দরজা বন্ধ করে দিলো।

বনহুর আর রহমান গাড়িতে এসে বসলো।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–আমার ব্যাগটা গাড়ির মধ্যে আছে তো?

হাঁ, সর্দার, আছে।

হোটেল কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর আর রহমান।

এখন তাদের শরীরে ভিন্ন ড্রেস। বনহুরকে দেখলে ঠিক ডক্টর হংকিং রাও এবং রহমানকে ঠিক ডক্টর মং লাও বলে মনে হবে।

বনহুর আর রহমান যখন হোটেল গুলবাগে এসে পৌঁছলো তখন হোটেলের দারোয়ান ছালাম জানিয়ে বললো–সাহাব, আপ-লোক কাহা গিয়াথা। হুজুর আপ লোক কা খাতির মে বহুত পেরেশান হওয়া ....

বনহুর আর রহমান কোন কথা না বলে মহববৎ আলীর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

মহববৎ আলী তার নিজস্ব কামরায় ব্যস্তভাবে পায়চারী করছিলো।

ডক্টর রাও ও মংলাওকে দেখে মহববৎ আলী থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো–আপনারা কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন তো? এতো রাত হলো, আপনাদের টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বাসায় যাবো। আমার মেয়ে পারভিনের অসুখ কিনা!

বনহুর ইতিপূর্বে ডক্টর হংকিং রাও এর কণ্ঠস্বর নকল করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো, মাথার ক্যাপটা আর একটু সম্মুখে টেনে দিয়ে বললো–একটা বিপদে পড়েছিলাম, বেঁচে গেছি।

আশ্চর্য হলো মহববৎ আলী–বিপদ! কি বিপদে পড়েছিলেন আপনারা?

দস্যু বনহুর আমাদের সন্ধান পেয়েছে – আমরা এ হোটেলে আছি।

দস্যু বনহুর ?

হাঁ,দস্যু বনহুর। সে-ই আমাদের আটক করেছিলো, অতি কষ্টে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

বলেন কি, দস্যু বনহুর তাহলে....

হাঁ, আবার তার আবির্ভাব ঘটেছে।

মংলাও- বেশি রহমান বনহুরের কথায় খুশি হরত পারলো না, কারণ এ কথাটা বলায় দেশবাসী আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তাছাড়া পুলিশ মহলেও সাড়া পড়ে যাবে। বনহুর এখন তবু ছদ্মবেশে শহরের নানা স্থানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তখন রাতের অন্ধকার ছাড়া আর উপায় থাকবেনা।

কিন্তু সর্দার যা ভাল বুঝবে তাই তো করবে। রহমান উসখুস্ করছিলো। বনহুর তার পায়ে মৃদু আঘাত করলো।

কাজেই আজ রাতের প্লেনেই আমরা কান্দাই ত্যাগ করতে চাই।

বনহুর বার বার ভীত ভাবে বাইরের দরজার দিকে তাকাতে লাগলো।

মহববৎ আলী বললো–তাহলে তো ভয়ঙ্কর কথা। দস্যু বনহুর যদি আপনাদের কিছু নিয়ে থাকে তাহলে আমার হোটেল অবধি ধাওয়া করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই তো আমার মনে হচ্ছে....

আসুন, আপনাদের টাকা-পয়সা সব গুছিয়ে নিন।

চলুন, আর মোটেই বিলম্ব করতে পারছিনা।

মহববৎ আলী হংকিং বৈশি বনহুর এবং মংলাওবৈশি রহমান সহ পাশের কামরায় গেলো। এ কক্ষেই ঔষধের বাক্সগুলো থরে থরে সাজানো ছিলো।

মহববৎ আলী যখন টাকার ব্যাগটা হংকিং রাও এর হাতে তুলে দিচ্ছিলো তখন হংকিং বেশি বনহুর চারদিকে এক নজর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলো।

টাকার ব্যাগ হাতে নিয়ে বনহুর দরজার দিকে পা বাড়ালো, মহববৎ আলী বলে উঠলো – আপনাদের স্যুটকেস এবং বেডিং -পত্র রইলো যে..

হংকিং রাও বললো–যেতে দিন ও সব। দস্যু বনহুর যদি এসে পড়ে তাহলে প্রাণ নিয়ে পালানো মুস্কিল হবে...

হংকিং বেশি দস্যু বনহুর আর মংলাও বেশি রহমান গাড়িতে চেপে বসলো।

হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে মহববৎ আলী হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বললো –আবার আসবেন তো?

বনহুর বললো ড্রাইভ্ আসন থেকে –অচিরেই আবার দেখা হবে বন্ধু...
গাড়ির শব্দে আর কিছু শোনা গেলনা।
পিছন আসনে রহমান আর ড্রাইভার বসে রইলো স্তব্ধ হয়ে।
সর্দারের কান্ডকলাপ দেখতে লাগলো তারা নির্বাক নয়নে।
শহরের পথ ধরে বনহুরের গাড়ি উল্কা বেগে ছুটে চললো।

❑

কেঁদে কেঁদে মনিরা নাজেহাল হয়ে পড়েছে। একেবারে পাগলিনীর মত। সেদিনের পর থেকে কেউ তাকে দানা-পানি খাওয়াতে পারেনি। অহঃরহ চোখের পানি বিসর্জন করে চলেছে মনিরা।

গভীর রাত।

মনিরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে। কদিন অবিরত কাঁদাকাটা করে একেবারে যা তা হয়ে গেছে।

পাশের কক্ষে মরিয়ম বেগম–এখনও তার চোখে ঘুম আসে নি। নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। স্বামীর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে বা ঘটছে সব স্মরণ হচ্ছে একটির পর একটি করে। মরিয়ম বেগম কোন দিন কি ভেবেছিলেন–তার অমন মহানুভব স্বামী লোক চক্রান্তে নিহত হবেন। কে তাকে হত্যা করেছিলো, কেনই বা করেছিলো –আজও জানেন না তিনি। তারপর নিজ সন্তান আজ সভ্য সমাজের সৎ ব্যক্তি না হয়ে হয়েছে দস্যু-ডাকু। লোক সমাজে তার স্থান নেই। মনিরাকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন, ওকে বিয়ে দিয়ে সন্তানকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আশাও তার পূর্ণ হয়নি। দস্যু সন্তানকে মায়ার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েও পারেনি। মরিয়ম বেগমের চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়ে উঠলো।

এশার আযান থেমে গেছে অনেকক্ষণ।

দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে এগিয়ে চলেছে সীমাহীন অজানার পথে।

মরিয়ম বেগমের নিদ্রাহীন আঁখি দু'টি অন্ধকারে ছল ছল করে উঠে বুক চীরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করেন– হে দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক .....

হঠাৎ মরিয়ম বেগম চমকে উঠেন, শুনতে পান মনিরার কক্ষে একটা চাপা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। মরিয়ম বেগমের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি কান পেতে চুপ করে রইলেন।

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে এলো আবার --- মনিরা, মনিরা আমি এসেছি----মনিরা ---

মনিরার কণ্ঠস্বর কে– কে তুমি ---ওগো তুমি এসেছো? ----সঙ্গে সঙ্গে মনিরার কান্নার শব্দ শোনা গেলো। পর মুহূর্তেই ক্রন্দন রত কণ্ঠ মনিরার— আমার নূর নেই, কে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে....

আমার নূর নেই....

নীরব নিস্তব্ধ বনহুর, কোন কথা বললো না সে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা ঠুকতে লাগলো– আমার নূর নেই। ওকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে -----ওগো আমি কি নিয়ে বাঁচবো ----আমি কি নিয়ে বাঁচবো -----কাঁন্নায় ভেংগে পড়ে মনিরা।

এতোক্ষণে কথা বলে বনহুর– মনিরা, এতো ভেংগে পড়লে চলবে কেনো? নূর তোমার সন্তান, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ধরে রাখতে পারবেনা। একদিন সে ফিরে আসবে তোমার পাশে...

আমি সে কথা শুনতে চাইনা, বলো আমার নূরকে তুমি খুঁজে এনে দেবে? বলো......ওগো বলো? বনহুরের জামা চেপে ধরে মনিরা।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো– মনিরা, একটা কথার জবাব দাও আমাকে?

বলো, বলো তুমি?

নূরকে চাও না আমাকে?

চিত্রাপিত্যের ন্যায় তাকায় মনিরা স্বামীর মুখে।

পরবর্তী বই

বন্দী বনহুর